জাদিগ ও কাঁদিদ
ভলত্যার
অনুবাদ : পুষ্কর দাসগুপ্ত ও অরুণ মিত্র

জাদিগ ও কাঁদিদ

ভলত্যার

অনুবাদ : পুষ্কর দাসগুপ্ত ও অরুণ মিত্র

জাদিগ ও কাঁদিদ ভলত্যার

অনুবাদ পুষ্কর দাসগুপ্ত ও অরুণ মিত্র

প্রকাশক রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল

নালন্দা

৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)

তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মুদ্রণ শামীম প্রিন্টিং প্রেস

বর্ণবিন্যাস নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

ভারতে পরিবেশক নয়া উদ্যোগ

Zadig O Candide Voltaire

Translator Pushkor Dasgupta & Arun Mitro

Cover Design Redwanur Rahman Jewel

First Published February 2019

Publisher Redwanur Rahman Jewel

Nalonda

38/4 Banglabazar (Mannan Market)

2nd Floor, Dhaka 1100

Phone 02-9590617

ISBN 978-984-93187-3-6

E-mail nalonda71 @gmail.com

সুলতানা শেরাকে নিবেদিত জাদিগ গ্রন্থের সাদি রচিত উৎসর্গপত্র

[১৮ শাওয়াল, সন ৮৩৭ হিজরি]

নয়নের মণির মায়াজাল, হৃদয়ের যন্ত্রণা, অন্তরের আলোক, আপনার চরণধূলি চুম্বনেও আমি অক্ষম, কেননা আপনি প্রায় পদচারণাই করেন না অথবা পারসিক গালিচা কিংবা গোলাপের ওপর পদসঞ্চার করেন। প্রাচীন এক জ্ঞানীর লেখা একটি গ্রন্থের এই অনুবাদ আপনাকে উৎসর্গ করছি। উক্ত জ্ঞানীর কোনো কাজ না থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, আর তার ফলে তিনি 'জাদিগ' উপাখ্যান রচনার দ্বারা আনন্দ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাহিত্যসৃষ্টি আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনে হয় তার চেয়ে গভীর অর্থবহ। আপনার কাছে প্রার্থনা, গ্রন্থটি পড়ে আপনি এ সম্পর্কে বিচার করবেন : কেননা, যদিও বর্তমানে আপনার জীবনের মধুমাস, যদিও যাবতীয় ভোগবিলাস আপনার সন্ধানে রত, যদিও আপনি রূপসি এবং যদিও আপনার সহজাত মেধা আপনার রূপকে বাড়িয়ে তুলেছে, যদিও সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্যন্ত লোকে আপনার গুণ-গান করে আর এসমস্ত কারণে যদিও কোনোরকমের কাণ্ডজ্ঞান না থাকার অধিকার আপনার রয়েছে, তবুও আপনার অন্তর একান্ত স্থিতধী এবং আপনার রুচি একান্ত পরিশীলিত, আর আপনাকে সূচ্যগ্র ফেজ পরিহিত, দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ দরবেশদের চাইতে অধিক বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করতে আমি শুনেছি। আপনি বিবেচক এবং বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধমনা নন; দুর্বল চিত্ত না হয়েও আপনি কোমল হৃদয়; আপনি বিবেচনাসহ পরহিতৈষী; বন্ধুরা আপনার প্রিয়, আর কাউকে আপনি শত্রু করে তোলেন না। আপনার মন কখনো পরচর্চা

থেকে আনন্দ আহরণ করে না; প্রভূত লোকের সম্ভবনা থাকলেও আপনি কারও কুৎসা বা ক্ষতি করেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনার অন্তঃকরণ চিরকাল আপনার সৌন্দর্যের মতোই নিষ্কলঙ্ক বলে আমার মনে হয়েছে। এমনকি দর্শন-চিন্তার ক্ষুদ্র এক সঞ্চয়ও আপনার মধ্যে বর্তমান, ফলে আমার ধারণা, একজন জ্ঞানীর লেখা এই গ্রন্থে অন্য যে কোনো নারীর চেয়ে আপনার অধিক রুচি হবে।

এই গ্রন্থে প্রথমে প্রাচীন ক্যাল্ডীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল, সে ভাষা যা আপনার বা আমার অবোধ্য। বিখ্যাত সুলতান উলুগ বেগ-এর মনোরঞ্জনের জন্য গ্রন্থটি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। সে সময়ে আরব ও পারসিকরা 'সহস্র এক রজনী', 'সহস্র এক দিবস' ইত্যাদি লিখতে শুরু করে। উলুগের অধিক পছন্দ ছিল জাদিগ পড়া; কিন্তু সুলতানরা বেশি পছন্দ করতেন ঐসব 'সহস্র এক'।

প্রাজ্ঞ উলুগ তাদের বলতেন, 'কী করে ঐ গল্পগুলো এত পছন্দ কর? ওগুলোর না আছে যুক্তি, না আছে অর্থ।'

সুলতানারা জবাব দিতেন, 'তার জন্যই তো গল্পগুলো আমাদের প্রিয়।'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সুলতানাদের মতো নন এবং আপনি সত্যিকারের এক উলুগ হয়ে উঠবেন। এমনকি আমার আশা, 'সহস্র এক' কাহিনিগুলোর মতো এবং তার চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক সাধারণ কথাবার্তায় আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে উঠবেন তখন মুহূর্তের অবকাশে আপনার কাছে যুক্তিযুক্ত কথা বলার সৌভাগ্য আমার হবে। যদি আপনি ফিলিপের পুত্র সিকান্দারের আমলে তালেস্ত্রিস হতেন, যদি সলোমনের আমলে সেবার রানি হতেন তাহলে ঐ রাজারই দেশ-দেশান্তর পরিক্রমা করতেন।

দিব্যশক্তির কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সুখ অবিমিশ্র, সৌন্দর্য অক্ষয় এবং সৌভাগ্য অন্তহীন হোক।

সাদি

জাদিগ

কানা

রাজা মোয়াবদারের আমলে ব্যাবিলনে জাদিগ নামে এক যুবাপুরুষ ছিলেন। তার সহজাত সুন্দর স্বভাবও শিক্ষার গুণে দৃঢ়তা লাভ করেছিল। ধনদৌলত এবং যৌবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের কামনা-বাসনাকে তিনি সংযত করতে জানতেন। তার মধ্যে কোনো রকম কপটতা ছিল না; সবসময় অভ্রান্ত হতে তিনি চাইতেন না আর মানুষকে দুর্বলভাবে শ্রদ্ধা করতে জানতেন। নিতান্ত অস্পষ্ট, নিতান্ত অসংলগ্ন, নিতান্ত মুখর যেসব উক্তি, যেসব দৃষ্ট পরনিন্দা, যেসব নির্বোধ সিদ্ধান্ত, যেসব আশালীন রসিকতা, যেমন অসার বাক্যের কলরবকে ব্যাবিলনে আলাপ বলে অভিহিত করা হতো, প্রভূত বিচার-বুদ্ধি সত্ত্বেও জাদিগ তাকে উপহাস দ্বারা অবমাননা করতেন, না দেখে লোকে অবাক হতো। জরাথ্রুস্টের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি পড়েছিলেন, অহমিকা বাতাসে ফোলানো বেলুন, সুচ ফুটিয়ে দিলেই তার থেকে বাতাস বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে জাদিগ কখনো নারীদের অপছন্দ করা আর দাবিয়ে রাখার বড়াই করতেন না। তিনি ছিলেন উদার, অকৃজ্ঞদের উপকার করলেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না; তার আদর্শ ছিল জরাথ্রুস্টের সেই মহৎ বাণী : কুকুর তোমায় কামড়ালেও কামড়াতে পারে, তবু নিজে খেতে বসলে ওদেরও খেতে দিও। মানুষের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব তিনি ছিলেন ততটা প্রাজ্ঞ, কেননা তিনি প্রাজ্ঞ লোকের সঙ্গ খুঁজতেন।

প্রাচীন ক্যাল্ডীয়দের বিজ্ঞানের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তার ফলে সে-যুগে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নিয়মাবলি লোকে যতটা জানত তা তাঁর অজানা ছিল না, আর যুগে যুগে লোকের পরাবিদ্যার যতটা জেনেছে তা, অর্থাৎ কি না যৎকিঞ্চিৎ তিনি জানতেন। তার আমলের নব্য দর্শন সত্ত্বেও তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বছরে তিনশ সওয়া পঁয়ষট্টি দিন আর জগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য; আর প্রধান পুরোহিতরা যখন অপমানজনক ঔদ্ধত্য নিয়ে তাকে বলতেন যে, তার মন পাপ-চিন্তায় ভরা এবং সূর্য নিজের কক্ষের ওপর ঘুরছে আর বছরে বারো মাস বিশ্বাস করাটা দেশদ্রোহিতা, তখন তিনি কোনোরকম রাগ বা অবজ্ঞা না দেখিয়ে চুপ করে থাকতেন।

বহু ধনদৌলতের মালিক হওয়ায় জাদিগের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব জুটেছিল, তার ওপর স্বাস্থ্য, মনোরম মুখশ্রী, সংযম এবং ন্যায়নিষ্ঠ মন, মহৎ আর অপকট হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় জাদিগের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সুখী হতে পারেন। সেমির-এর সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। রূপ, বংশামর্যদা ও সম্পদভাগ্যে মেয়েটি ছিল ব্যাবিলনের বিবাহযোগ্য পাত্রীদের প্রধান। তার প্রতি জাদিগের অনুরাগ ছিল পবিত্র এবং অবিচল, আর সেমির জাদিগকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। মিলনের শুভ মুহূর্তকে তারা ছুঁতে চলেছিলেন, সেই সময় ব্যাবিলনের প্রবেশপথের কাছে ইউফ্রেটিসের তীরকে সাজিয়ে রাখা খেজুর বীথির ছায়ার একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে তাদের চোখে পড়ল তরবারি আর তির নিয়ে কিছু লোক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঐ লোকগুলো কোনো এক মন্ত্রীর ভাইপো তরুণ অর্ক সাকরেদ; কাকার মোসায়েববা অর্ক'কে মাথায় ঢুকিয়েছিল যে সে যা খুশি করতে পারে। জাগিদের রূপ বা গুণের কণামাত্র তার ছিল না, অথচ নিজেকে সে অনেক বেশি যোগ্য বলে বিবেচনা করত, ফলে কোনোরকম গুরুত্ব না পেয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র আত্মম্ভরিতা থেকে জন্মানো ঈর্ষায় তার ধারণা হয়েছিল যে সেমিরকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তোকে সে জোর করে নিয়ে যেতে চাইল। হরণকারীরা সেমিরকে ধরে ফেলল আর হিংস্রতার উত্তেজনায় তাকে আহত করল, যাকে দেখলে ইমায়ুস-শৃঙ্গের ব্যাঘ্রের অন্তরও কোমল হয়ে উঠত সেই মনুষ্য-শরীর থেকে তারা রক্তপাত ঘটাল। করুণ বিলাপে সেমির আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল।

নিজের বিপদ নিয়ে সে একটুকু চিন্তিত ছিল না, প্রিয় জাদিগের কথাই শুধু তার মনে হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে বীরত্ব আর প্রেমের সবটুকু শক্তি দিয়ে জাদিগ সেমিরকে রক্ষা করেছিলেন। দুজন মাত্র ক্রীতদাস নিয়ে হরণকারীদের তিনি তাড়িয়ে দিলেন এবং রক্তাপ্লুত ও মূর্ছিত সেমিরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। চোখ খুলে সেমির তার উদ্ধারকারীকে দেখতে পেল।

জাদিগকে দেখে বলল, 'জাদিগ, আপনাকে আমি স্বামীর মতো ভালোবাসতাম, এখন ভালোবাসি আমার প্রাণ আর মানের রক্ষাকর্তা হিসেবে।'

কোনো অন্তর কখনো সেমিরের হৃদয়ের মতো আবেগবিহ্বল হয়ে ওঠেনি। এর চেয়ে সুন্দর কোনো মুখ এর চেয়ে মর্মস্পর্শী আবেগ কখনো ভাষায় প্রকাশ করেনি। সবচেয়ে মহৎ কর্মের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ঐ ভাষার মধ্যে ছিল সবচেয়ে গভীর প্রেমের সবচেয়ে কমনীয় উচ্ছ্বাস। সেমিরের আঘাত ছিল সামান্য, শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠল। জাদিগ তার চেয়ে বিপজ্জনকভাবে আহত হয়েছিলেন। তিরের আঘাতে তার চোখে গভীর একটা ক্ষত হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রেমাস্পদের সুস্থ হওয়া ছাড়া সেমির আর কিছুই দেবতার কাছে চাইছিল না। রাতদিন তার নিজের চোখ অশ্রুজলে সিক্ত হচ্ছিল, কখন যে জাদিগের চোখ তার দৃষ্টির সুখ অনুভব করতে পারবে সেই মুহূর্তটির জন্য সে অপেক্ষা করেছিল; কিন্তু আঘাত পাওয়া চোখে একটা ফোড়া দেখা দেওয়ায় খুবই আশংকার সৃষ্টি হলো। মেম্‌ফিস থেকে ভিষগাচার্য এর্মেসকে ডেকে পাঠানো হলো বিরাট দলবল সহ এর্মেস উপস্থিত হলেন। রোগীকে দেখে তিনি বলে দিলেন যে, রোগী একটি চোখ হারাবেন; এমনকি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দিনক্ষণ পর্যন্ত তিনি আগে থেকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'ডান চোখ হলে আমি সারিয়ে দিতাম, কিন্তু বাঁ চোখের ক্ষত সারানো অসম্ভব।'

জাদিগের ভাগ্যের জন্য দুঃখ করতে করতে সারা ব্যাবিলন এর্মেসের জ্ঞানের গভীরতার প্রশংসা করতে লাগল। দুদিন পর, ফোড়াটা আপনা থেকেই ফেটে গেল; জাদিগ পুরোপুরি সেরে উঠলেন। এর্মেস একটি বই লিখে ফেললেন, তাতে তিনি জাদিগের কাছে প্রমাণ করে দিলেন যে, তার সুস্থ হওয়াট উচিত হয়নি। জাদিগ সেই

গাঁয়ের বাড়িতে ছিলেন। যেতে যেতে জাদিগ শুনতে পেলেন যে ঐ সুন্দরী মহিলা কানাদের ওপর তার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা জোর গলায় ঘোষণা করে সে রাতেই অর্কিকে বিয়ে করে ফেলেছে। এ সংবাদে জাদিগ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কষ্টের ওপর জয়ী হলো যুক্তি, আর তার উপলব্ধির কঠোরতাই তাকে প্রবোধ দেওয়ায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠল।

তিনি বললেন, 'রাজদরবারে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ের নিষ্ঠুর খেয়ালের ফল আমাকে ভোগ করতে হলো, তাই আমার উচিত কোনো সাধারণ ঘরের মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া।'

আজোরাকে তার পছন্দ হলো। আজোরা শহরের সবচেয়ে শান্তশিষ্ট আর সবচেয়ে সদ্‌বংশের মেয়ে; তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর জাদিগ মিলিত জীবনের সবচেয়ে কমনীয় মাধুর্যের মধ্যে একটি মাস কাটালেন। শুধু একটিমাত্র ব্যাপার জাদিগের চোখে পড়ল, আজোরা কিছুটা চপল আর তার একান্ত বিশ্বাস যে, সুদর্শন যুবকরাই সবচেয়ে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর বিচক্ষণ হয়।

নাক

আজোরা একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল; রাগে গরগর করতে করতে সে বাড়ি ফিরে এলো।

জাদিগ জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয়তমা, কী হলো তোমার? কে তোমার মেজাজ এমন বিগড়ে দিল?'

আজোরা বলল, 'হায় রে, যে দৃশ্য আমি এইমাত্র দেখে এলাম তা দেখলে তোমার অবস্থাটাও আমার মতো হতো। সদ্য বিধবা তরুণী কসরুকে আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলাম। ঘাসে ঢাকা মাঠের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা জলস্রোত বয়ে চলেছে; দুদিন হলো, তারই পাশে কসরু তার তরুণ স্বামীর সমাধি তৈরি করিয়েছে; শোকে মুহ্যমান হয়ে দেবতাদের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে যতদিন ঐ জলস্রোত পাশ দিয়ে বয়ে যাবে ততদিন সে সমাধির কাছে পড়ে থাকবে।'

জাদিগ বললেন, 'তাহলে দেখ, স্বামীকে সত্যিই ভালোবাসত এমন একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা রয়েছেন।'

আজোরা বলতে থাকল, 'আঃ! আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন যে সে কী করছিল তা যদি জানতে?'

কি করছিল, সুন্দরী আজোরা?'

সে জলের স্রোতটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল।

এমন লম্বা-চওড়া কথা বলে সে দুঃখ করতে লাগল, বিধবার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার এমন ফেটে পড়ল যে ঐ সতীত্ব জাহির করাটা জাদিগের ভালো লাগল না।

কাদর নামে জাদিগের এক বন্ধু ছিলেন। যাদের মধ্যে তার স্ত্রী অন্য সবার চাইতে বেশি সততা এবং গুণপনা দেখতে পেত কাদর ছিলেন সেই যুবকদের একজন। জাদিগ কাদরকে তার মনের কথা সব খুলে বললেন আর দামি একটা উপহার দিয়ে কাদরের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যতটা নিশ্চিত হলেন। এক বান্ধবীর গাঁয়ের বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে তিন দিনের দিন আজোরা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন চাকরবাকরেরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে জানাল যে সে রাতেই তার স্বামী হঠাৎ করে মারা গেছেন, ভয়ঙ্কর সেই খবরটা তাকে দেওয়ার সাহস তাদের হয়নি আর জাদিগকে বাগানের শেষ প্রান্তে তার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। আজোরা কান্নাকাটি করল, চুল ছিঁড়ল এবং নিজের প্রাণ দেবে বলে দিব্যি গালল। সন্ধ্যাবেলা কাদর এসে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন আর তারা দুজনে কাঁদল। পরের দিন তারা আর ততটা কাঁদল না এবং একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারল। কাদর জানালেন যে তার বন্ধু নিজের সম্পত্তির বেশিরভাগটাই কাদরকে দিয়ে গেছেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে আজোরাকে ঐ সম্পত্তির অংশীদার করতে পারলে তিনি সুখী হবেন। মহিলা কান্নাকাটি করল, রেগে উঠল, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। রাতের খাওয়াটা দুপুরের চেয়ে দীর্ঘ হলো; দুজনের কথাবার্তায় আরও আন্তরিক হয়ে উঠল: আজোরা মৃত স্বামীর প্রশস্তি করল, তবে সে অকপটে স্বীকার করল যে জাদিগের কিছু কিছু দোষ ছিল যার থেকে কাদর মুক্ত।

খেতে খেতে পাঁজরের প্রচণ্ড ব্যথায় কাদর কাতরাতে লাগলেন। মহিলা উদ্বিগ্ন আর উদ্‌ব্যস্ত হয়ে যেসব সুগন্ধি মাখত তার সবগুলো আনল, দেখতে চাইল তার মধ্যে কোনোটা যদি পাঁজরের ব্যথায় কাজ দেয়। মহামতি এর্মেস তখন আর ব্যাবিলনে নেই বলে সে খুবই দুঃখ করল। এমনকি কাদরের যে, পাশটায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল সে তা ধরেও দেখতে চাইল।

সহানুভূতির সঙ্গে সে তাকে বলল, 'আপনি এই উৎকট রোগের স্বীকার?'

কাদর জবাব দিলেন, 'মাঝে মাঝেই এই রোগ আমায় মরো-মরো করে তোলে, আর একটিমাত্র ওষুধ আমায় দিতে পারে, সেটা হলো আগের দিন মারা যাওয়া কোনো লোকের নাক আরাম পাঁজরায় ঘষা।'

আজোরা বলল, 'এ এক আজব ওষুধ।'

জবাবে কাদর বললেন, 'মৃগী রোগের দাওয়াই আর্নু[১] মশায়ের পুরিয়ার চেয়ে আজব নয়।'

এমন যুক্তি, আর তার ওপর যুবকটির অশেষ গুণের জন্য মহিলা মনস্থির করতে বাধ্য হলো।

সে বলল, 'যাই হোক, আমার স্বামী যখন চিনাভার সেতুর ওপর দিয়ে গতকালের জগৎ থেকে আগামীকালের জগতে যাবেন তখন প্রথম জীবনের তুলনায় দ্বিতীয় জীবনে তার নাক একটুখানি খাটো হলে জমদূত আজরাইল কি তাকে একটু কম রাস্তা দেবেন?'

অতএব একটা ক্ষুর নিয়ে সে স্বামীর কবরে গেল। চোখের জলে কবর ভিজিয়ে দিয়ে সে জাদিগের নাক কাটতে এগিয়ে গেল। সে দেখতে পেল জাদিগ কবরের ভিতর শুয়ে রয়েছেন। এক হাতে নাক চেপে আর অন্য হাতে ক্ষুর আটকে জাদিগ উঠে দাঁড়ালেন।

আজোরাকে তিনি বললেন, 'মিসেস, তরুণী কসরুর বিরুদ্ধে অত আর চেঁচিয়ো না; জলস্রোতের গতি পালটানোর মতলবের চেয়ে আমার নাক কাটার মতলবটা কমতি যায় না।'

কুকুর আর ঘোড়া

জাদিগ উপলব্ধি করলেন যে জেন্দ গ্রন্থে যা লেখা আছে সে কথাই খাঁটি—বিয়ের পর প্রথম মাসটি হলো মধুচন্দ্রিমা আর দ্বিতীয় মাস ধুস্তুরীচন্দ্রিমা। আজোরার সঙ্গে থাকাটা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল, ফলে কিছুদিন বাদে জাদিগ তাকে ছাড়তে বাধ্য হলেন। এরপর তিনি প্রকৃতির রহস্য অনুশীলনের মধ্যে সুখের সন্ধান করতে লাগলেন।

তিনি ভাবতে লাগলেন, 'আমাদের চোখের সামনে ঈশ্বর এক মহাগ্রন্থ খুলে রেখেছেন, যে দার্শনিক সে গ্রন্থ পাঠ করেন তাঁর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেন তা তার নিজস্ব; তা তার অন্তরাত্মার ক্ষুধা মেটায়, তাকে লালন করে; শান্তিময় তার জীবন, মানুষের কাছ থেকে ভয় পাওয়ার মতো কিছুই তার থাকে না, আর দয়াময়ী স্ত্রী কখনো তার নাক কাটতে আসে না।'

এ সমস্ত ভাবনা মাথায় নিয়ে তিনি ইউফ্রেটিসের তীরে এক গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পুলিশের খিলানের তলা দিয়ে প্রতি অনুপলে কত আঙুল জল বয়ে যায় কিংবা মেষ মাসের চেয়ে এক ঘন কর বেশি বৃষ্টি পড়ল কি না তার হিসাবে কষে তিনি সময় কাটাতেন না। মাকড়সার জাল থেকে রেশম অথবা ভাঙা শিশি-বোতল থেকে চীনামাটির বাসন তৈরির চিন্তা তার মাথায় কখনো উদয় হতো না; তবে তিনি বিশেষভাবে প্রাণী আর গাছপালার বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করে অল্পকালের মধ্যে এমন এক বিচক্ষণতা লাভ করলেন যাতে করে অন্য লোকের কাছে যা একই রকম মনে হতো সেখানে তার চোখে হাজার পার্থক্য ধরা পড়ত।

একদিন ছোট্ট একটা বনের ধারে তিনি বেড়াচ্ছিলেন। তার চোখে পড়ল রানির এক খোজা তার দিকে ছুটে আসছে, তার পেছনে কয়েকজন রাজপুরুষ; তাদের খুবই উদ্বিগ্ন বলে বোধ হচ্ছে, আর হারিয়ে যাওয়া দারুণ মূল্যবান কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে পথ হারানো মানুষের মতো তারা ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে।

প্রধান খোজা জাদিগকে বলল, 'তরুণ যুবক, রানির কুকুরকে কি আপনি দেখেননি?'

জাদিগ বিনীতভাবে জবাব দিল, 'ওটা তো ঠিক কুকুর নয়, মাদি কুকুর।'

প্রধান খোজা ঠিক বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন।'

জাদিগ আরও বললেন, 'ওটা খুবই ছোটজাতের লোমওয়ালা একটা মাদি কুকুর কয়েকদিন আগে ও বিইয়েছে, সামনের বাঁ পায়েও খুঁড়িয়ে চলে, আর ওর কান দুটো খুবই লম্বা।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রধান খোজা বলল, 'আপনি তাহলে ওকে দেখেছেন?'

জবাবে জাদিগ বললেন, 'না, আমি ওকে জীবনে দেখিনি। আমি জানতামই না যে রানির একটা মাদি কুকুর আছে।'

ঠিক এই সময়ে, ভাগ্যের নগণ্য এক উদ্ভট খেয়ালে রাজার ঘোড়াশালের সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়াটা ব্যাবিলনের মাঠে সহিসের হাত ছিটকে পালিয়েছিল। প্রধান

খোজা যেমন রানির কুকুরের পিছনে ছুটেছিল তেমনই রাজার মুখ্য পশুপালক ও অন্যান্য রাজপুরুষরা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোড়ার খোঁজে ছুটল। মুখ্য পশুপালক জাদিগের কাছে এসে রাজার ঘোড়াকে যেতে দেখেছে কি না জানতে চাইল।

জাদিগ জবাব দিলেন, 'ঘোড়াটার কদমের কোনো তুলনা হয় না, ও উঁচুতে সাড়ে তিন হাত, ওর ক্ষুর বেশ ছোট, লেজটা সোয়া দুহাত লম্বা, লাগামে গিনি সোনার কাজ, ক্ষুরে একরতি খাদ দেওয়া রুপার নাল।'

মুখ্য পশুপালক জিজ্ঞেস করল, 'ঘোড়াটা কোন পথে গেছে? কোথায় রয়েছে?'

জাদিগ উত্তর দিলেন, 'ঘোড়া আমি দেখেনি, আর ওর কথা জীবনে শুনিনি।

মুখ্য পশুপালক আর প্রধান খোজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে জাদিগ রাজার ঘোড়া আর রানির কুকুর চুরি করেছেন; তারা তাকে মহাদেস্তেরামের দরবারে নিয়ে গেল, মহাদেস্তেরাম জাদিগকে বেত মারার আর বাকি জীবনটা সাইবেরিয়ায় কাটানোর শাস্তি দিলেন। দণ্ডাদেশ দিতে-না-দিতেই ঘোড়া আর কুকুরের খোঁজ পাওয়া গেল। বিচারকদের ঘাড়ে চাপল রায় পালটানোর কষ্টকর দায়িত্ব। তবে যা চোখে দেখেছেন তা দেখেননি বলার জন্য তারা জাদিগকে চারশো মোহর জরিমানার আদেশ দিলেন। প্রথমে জরিমানার টাকাটা জমা দিয়ে দিতে হলো, তারপর জাদিগ মহাদেস্তেরামের মন্ত্রণাসভায় আত্মাপক্ষ সমর্থন করার অনুমতি পেলেন।

তিনি বললেন, 'ন্যায়বিচারকদের নক্ষত্রমণ্ডলী, প্রজ্ঞার অতল সমুদ্র, সত্যের দর্পণ, আপনাদের রয়েছে সীসকের গুরুভার, লৌহের হীরকের দীপ্তি এবং স্বর্ণের সঙ্গে প্রভূত সাদৃশ্য। আমাকে যেহেতু এই মহতী সভার সামনে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে আমি তাই অরোস্মাদের নামে শপথ করে বলছি যে, আমি কখনো রানির মাননীয়া কুকুরকে কিংবা রাজাধিরাজের পবিত্র অশ্বকে চোখে দেখিনি। আমার ঘটনাটা বলছি। ছোট্ট বনের পথে বেড়াতে বেড়াতে শ্রদ্ধেয় খোজা আর মহামান্য মুখ্য পশুপালকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। বালির ওপর একটা পশুর পায়ের ছাপ দেখে আমি সহজেই বুঝতে পারলাম, ওই ছাপ কোনো ছোট জাতের কুকুরের। থাবার দাগগুলোর মাঝামাঝি উঁচুমতোন বালির ওপর লম্বা আলোর মতো হালকা ছাপ, তাতে আমি বুঝলাম যে কুকুরটা মাদি আর ওর স্তন ঝুলে পড়েছে, তার মানে দিন কয়েক আগে ও বাচ্চা দিয়েছে। বিপরীতমুখী আরও কিছু ছাপ সবসময় যেন সামনের থাবার পাশ দিয়ে বালির ওপরটা চেঁছে গেছে, এতে বুঝতে পারলাম কুকুরটার কান খুবই লম্বা; আমার নজরে পড়েছিল, তিনটি পায়ের তুলনায় একটি পায়ের থাবা সবসময় বালিতে কম গর্ত করে গেছে। ধৃষ্টতা মার্জনা করলে বলতে পারি এর থেকে আমার ধারণা হলো, আমাদের মহামান্য রানির কুকুরটি সামান্য খোঁড়া।

রাজাধিরাজের ঘোড়ার কথাটা শুনুন। ঐ বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘোড়ার নালের দাগ আমার নজরে পড়ল: সবকয়টি দাগের মধ্যে সমান ফাঁক। মনে মনে ভাবলাম, ঐ ঘোড়াটার কদম একেবারে নিখুঁত। মাত্র সাড়ে চার হাত চওড়া সরু পথের ডাইনে-বাঁয়ে মাঝরাস্তা থেকে সওয়া দুহাত পর্যন্ত গাছপালার ধুলো কিছুটা মুছে গেছে। ভাবলাম, ঘোড়াটার লেজ সোয়া দুহাত লম্বা, ডাইনে-বাঁয়ে আন্দোলনে লেজটা ঐ ধুলো ঝাঁট দিতে দিতে গেছে। যে গাছগুলো পৌনে চার হাত উঁচু তোরণের মতো পথ তৈরি করেছে তাদের তলায় আমি ডাল থেকে সদ্য খসে পড়া পাতা দেখে তার থেকে ধরতে পারলাম ঐ ঘোড়াটা গাছগুলো ছুঁয়ে গেছে, তাহলে ওটা উঁচুতে পৌনে চার হাত। আর লাগামের কথা বলতে গেলে, সেটা চব্বিশ ভাগের এক ভাগ পান দেওয়া সোনার না হয়ে পারে না, কেননা ঘোড়াটা লাগামের কারুকাজ একটা পাথরে ঘষেছিল। আমি চিনেছিলাম পাথরটা কষ্টিপাথর আর তার থেকে আমি ব্যাপারটা বার করেছিলাম। অবশেষে আরেক ধরনের নুড়ির ওপর নালের দাগ থেকে আমার ধারণা হলো ঘোড়াটার ক্ষুরের বারো ভাগের এক ভাগ রুপা দিয়ে ঘোরার পায়ের নাল পরানো।'

বিচারকরা সবাই জাদিগের গভীর এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করলেন; খবরটা রাজা ও রানির কান অব্দি পৌঁছে গেল। রাজার প্রতীক্ষাকক্ষে, শয়নকক্ষে এবং মন্ত্রণাকক্ষে জাদিগের কথা বলাবলি হতে লাগল; যদিও কয়েকজন পুরোহিত বিধান দিলেন যে, পিশাচসিদ্ধ বলে জাদিগকে পুড়িয়ে মারা উচিত। রাজা শাস্তি হিসেবে জরিমানা করা চারশো মোহর জাদিগকে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। চারশো মোহর ফেরত দেওয়ার জন্য দপ্তিদার, কোটাল, তহশিলদার মহাসমারোহে জাদিগের বাড়ি হাজির হলেন। মামলার খরচ হিসেবে মাত্র তিনশো আটানব্বই মোহর তারা কেটে রাখলেন, আর তাদের খানসামরা নজরনার দাবি জানাল।

অতিজ্ঞানী হওয়াটা যে কখনো কখনো বিপদ ডেকে আনে জাদিগ তা টের পেলেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন, পরের বার থেকে কিছু চোখে পড়লেও তা বলবেন না।

শীঘ্রই সেরকম একটা ঘটনা ঘটল। সরকারি এক কয়েদি পালাল; লোকটি জাদিগের বাড়ির জানালার তলা দিয়ে গিয়েছিল। জাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তিনি কোনো জবাব দিলেন না; অথচ প্রমাণিত হলো যে তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন। এই অপরাধে তার পাঁচশ মোহর জরিমানা হলো, আর ব্যাবিলনের রীতি অনুসারে করুণা করার জন্য জাদিগ বিচারকদের ধন্যবাদ জানালেন।

তিনি নিজের মনে বললেন, 'হায় ঈশ্বর, রাজার ঘোড়া কি রানির কুকুর যে বন দিয়ে গেছে সেখানে বেড়াতে গেলে ভোগান্তি হয়! জানালায় দাঁড়ানোটাও কেমন বিপদ ডেকে আনে! আর এ জীবনে সুখী হওয়াটা যে কী কঠিন!'

হিংসুক

দর্শন আর বন্ধুত্বের সাহায্যে জাদিগ নিয়তির দেওয়া দুঃখে সান্ত্বনা পেতে চাইলেন। ব্যাবিলনের শহরতলিতে তার একটি চমৎকার সাজানো-গোছানো বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি ভদ্রলোকের উপযুক্ত সব রকমের শিল্পকলা আর আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করতেন। সকালবেলা, তাবৎ পণ্ডিতের জন্য তার গ্রন্থাগার অবারিত থাকত, সন্ধ্যায় তার খাওয়ার ঘর খোলা থাকত সজ্জন সঙ্গীদের জন্য। পণ্ডিতেরা যে কী ভয়াবহ তা তিনি অচিরেই টের পেলেন। জরাথ্রুস্টের একটি বিধান সম্পর্কে দারুণ তর্ক উপস্থিত হলো; জরাথ্রুস্ট শ্যেন সিংহ খেতে নিষেধ করেছেন।

একদল বললেন, 'শ্যেন সিংহের কোনো অস্তিত্ব না থাকলে প্রাণীটা নিষিদ্ধ হয় কী করে?'

অন্যেরা বললেন, 'জরাথ্রুস্ট যখন চান না ওটা লোকে খাক তখন প্রাণীটাকে থাকতেই হবে।'

তাদের বিবাদ মেটানোর জন্য জাদিগ বললেন, 'শ্যেন সিংহ যদি থেকে থাকে আমরা তা খাই না, যদি নাই থাকে তাহলে খাওয়ার সম্ভবনা আরও কম, আর এর ফলে আমরা সবাই জরাথ্রুস্টকে মেনে চলব।'

বিখ্যাত এক ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্যেন সিংহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তেরো খণ্ডের বই লিখেছিলেন। তিনি জাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য ইয়েবর নামে প্রধান পুরোহিতের কাছে ছুটে গেলেন। ইয়েবর ছিলেন ক্যাল্ডীয়দের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ আর তার ফলে সবচেয়ে ধর্মান্ধ। এই লোকটি পারলে সূর্যদেবতার অপার মহিমায় জাদিগকে শূলে চড়াতেন, আর তার জন্য গদগদ কণ্ঠে জরাথ্রুস্টের মন্ত্র আওড়াতেন।

বন্ধু কাদর (শত যাজকের চেয়ে একজন বন্ধু মূল্যবান) বৃদ্ধ ইয়েবরের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, 'জয় হোক সূর্যের আর শ্যেন সিংহদের। জাদিগকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত হোন; জাদিগ একজন সিদ্ধপুরুষ; তার ভেতর-বাড়ির উঠোনে কিছু শ্যেন সিংহ রয়েছে এবং সেগুলো তিনি কখনো খান না; আর তাঁর বিরুদ্ধে যে লোকটা নালিশ করেছে সে ঘোর অনাচারি, তার এত বড় স্পর্ধা, সে বলে কি না খরগোশের পায়ের পাতা দুভাগ করা আর খরগোশ মোটেই অপবিত্র নয়!'

টেকো মাথা নাড়তে নাড়তে ইয়েবর বললেন, 'তাহলে শ্যেন সিংহ সম্বন্ধে অন্যায় কথা ভাবার জন্য জাদিগকে আর খোরগোশ সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলার জন্য অপর জনকে শূলে চড়ানো উচিত।'

রানির এক সহচরীকে দিয়ে কাদর ঝামেলাটার নিষ্পত্তি করালেন। কাদরের ঔরসে ঐ সহচরীটির একটি সন্তান হয়েছিল আর পুরোহিত-সংঘে মেয়েটির প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। তাই কাউকেই আর শূলে চড়ানো হলো না; এতে কয়েকজন বিদ্যালংকার গজগজ করতে লাগলেন আর ব্যাবিলন রসাতলে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

জাদিগ বলে উঠলেন, 'সুখ তবে কীসে! এ জগতে সবকিছুই, এমনকি যেসব জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই তারা অব্দি আমায় উৎপীড়ন করছে।'

পণ্ডিতদের শাপান্ত করে একমাত্র সজ্জন সঙ্গীদের নিয়ে জীবন কাটাবেন বলে জাদিগ স্থির করলেন।

নিজের বাড়িতে তিনি ব্যাবিলনের সবচেয়ে ভদ্রলোক এবং সবচেয়ে অমায়িক মহিলাদের সমাবেশ ঘটাতে লাগলেন। রাতের খাওয়াটা হতো খুবই রুচিকর। প্রায়ই খাওয়ার আগে গান-বাজনা থাকত। আর খাওয়ার আসর আকর্ষণীয় কথাবার্তায় জমে উঠত: ঐ কথাবার্তা থেকে বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করার আগ্রহকে দূরে সরিয়ে রাখতে তিনি শিখেছিলেন, কেননা সবচেয়ে চমৎকার আসরকে বিরক্তিকর আর মাটি করার জন্য ঐ আগ্রহই হলো সবচেয়ে অমোঘ উপায়! অহমিকার বশে বন্ধু বা খাদ্য নির্বাচন করা হতো না : কেন না সবকিছুতেই জাহির করার চেয়ে হয়ে ওঠাকে জাদিগ বেশি পছন্দ করতেন; আর এর ফলে অযাচিতভাবে তিনি যথার্থ শ্রদ্ধা লাভ করতেন।

জাদিগের বাড়ির মুখোমুখি বাস করত আরিমাজ; লোকটার দুষ্ট অন্তর যেন তার কদাকার মুখের ওপর ফুটে উঠত। সে ছিল বিদ্বেষে ক্ষয়ে যাওয়া আর অহংকারে ফাঁপা, তাছাড়া সবকিছুকে ছাড়িয়ে তার বিদ্যাবুদ্ধির ভড়ংটা ছিল বিরক্তিকর। সমাজে মান্যগণ্য হতে পারেনি বলে পরের কুৎসা রটনা করে সে তার ঝাল মেটাত। যথেষ্ট ধনী হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে মোসাহেব জোটানোটা তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। সন্ধ্যাবেলা জাদিগের বাড়ির গাড়িঘোড়া ঢোকার আওয়াজ তাকে পীড়া দিত, জাদিগের প্রশংসার গুঞ্জরণ তাকে আরও অতিষ্ঠ করে তুলত। কখনো কখনো বা জাদিগের বাড়িতে গিয়ে সে অনাহূতভাবেই খেতে বসে যেত : সমস্ত আসরটাকে সে কলুষিত করত, কথায় যেমন বলে আপি যে মাংস ছোঁয় তাকেই দূষিত করে দেয়। ঘটনাচক্রে একদিন এক মহিলাকে আপ্যায়নের জন্য সে একটা ভোজের আয়োজন করতে চাইল, মহিলা তার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে জাদিগের বাড়ি খেতে গেলেন। আরেক দিন রাজবাড়িতে জাদিগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারা এক মন্ত্রীর সামনে পড়ল। মন্ত্রী জাদিগকে বাড়িতে খেতে ডাকলেন আর আরিমাজকে ডাকলেন না। সবচেয়ে তীব্র ঘৃণার প্রায় কোনো গুরুত্বই থাকে না। ব্যাবিলনে লোকে এই লোকটির নাম দিয়েছিল 'হিংসুক', সে জাদিগের সর্বনাশ করতে চাইল, কারণ লোকে জাদিগকে বলত 'সুখী'। জরাথ্রুস্ট তো বলেছেন, অনিষ্ট করার সুযোগ আসে দিনে একশো বার আর ইস্ট করার সুযোগ বছরে একবার।

হিংসুক জাদিগের বাড়ি গেল। দুজন বন্ধু আর এক মহিলার সঙ্গে জাদিগ তখন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। মহিলাকে খুশি করার জন্য প্রায় তিনি কিছু না কিছু বলে যাচ্ছিলেন সে কেবল মহিলার সঙ্গে কথা বলার খাতিরেই বলা, জাদিগের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। মহারাজ তার সামন্ত ইর্কানির রাজার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে এলেন তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। অল্প কয়েকদিনের এই যুদ্ধে যিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই জাদিগ মহারাজের প্রভূত প্রশস্তি করলেন, আর ততোধিক প্রশস্তি করলেন মহিলার। নিজের নাম লেখা কাগজ বের করে তাতে তৎক্ষণাৎ রচনা করা কবিতার চারটি চরণ লিখে তিনি ঐ সুন্দরীকে পড়তে দিলেন। বন্ধুরা তাকে কবিতাটি দেখাতে অনুরোধ করলেন : বিনয় কিংবা বলা যায় স্পষ্টত একটা আত্মমর্যাদার বশে তিনি সে লেখা দেখাতে রাজি হলেন না। তিনি জানতেন তাৎক্ষণিক কবিতা যে নারীর স্তুতি করে লেখা তার ছাড়া আর কারও ভালো লাগে না : যে কাগজটায় তিনি লিখেছিলেন তা দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন আর ছেঁড়া টুকরো দুটো গোলাপ ঝোপে ফেলে দিলেন। খোঁজাখুঁজি করে টুকরো দুটি সেখানে পাওয়া গেল। হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামল। ওরা সবাই বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। হিংসুক কিন্তু বাগানের ভেতর থেকে গেল। খুঁজতে খুঁজতে শেষ অব্দি সে কাগজের একটি টুকরো পেয়ে গেল : কাগজটা এমনভাবে টুকরো হয়ে গিয়েছিল যে প্রতিটি পঙতিজোড়া আধখানা করে চরণ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল আর এমনকি কম মাত্রার পুরো চরণে পরিণত হয়েছিল; আর তারও চেয়ে তাজ্জব কাণ্ড হলো যে ঐ ছোট চরণগুলোতে রাজার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর বিষোদ্‌গারে ভরা একটি মানে তৈরি হয়েছিল। পঙ্‌ক্তিগুলোর পাঠ দাঁড়িয়েছিল :

"ভয়াবহ কীযে অনাচারে
সিংহাসনে দৃঢ় অবিচলে
শান্তিময় জগৎসংসারে
চিরশত্রু সেই তো কেবল"

হিংসুক জীবনে এই প্রথম সুখী হলো। একজন অমায়িক গুণী লোকের সর্বনাশ করার অস্ত্র যে তার হাতে। এই নিষ্ঠুর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জাদিগের হাতে লেখা ঐ শ্লেষাত্মক রচনাটি সে রাজার কাছে পৌঁছে দিল : দুই বন্ধু আর সেই মহিলাটিসহ জাদিগকে কয়েদ করা হলো, অবিলম্বে তার মামলার বিচার হলো, তার কথা কেউ শুনতে চাইল না। জাদিগ যখন দণ্ডাদেশ নিতে গেলেন তখন হিংসুক তার যাওয়ার পথে উপস্থিত হলো, সে চিৎকার করে জাদিগকে বলল যে তার কবিতাটি অতি বাজে। বড় কবি হওয়ার কোনো অহংকার জাদিগের ছিল না; তবে মহামান্য রাজার বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হয়ে এবং যে অপরাধ তিনি করেননি তার জন্য একজন সুন্দরী মহিলা আর দুই বন্ধুকে বন্দি হতে দেখে তিনি মর্মাহিত হয়ে পড়েছিলেন। কোনো কথা তাকে বলতে দেওয়া হলো না, কেননা তার নাম লেখা কাগজই সব বলে দিচ্ছিল। এটাই ছিল ব্যাবিলনের আইন। একদল কৌতূহলী লোকের মধ্য দিয়ে তাকে শাস্তি নিতে যেতে হলো। তার জন্য দুঃখ করার সাহস কারও হচ্ছিল না, আর তারা ছুটেছিল তার মুখ লক্ষ করতে, তিনি অবিচলভাবে পরলোকগমন করেছেন কি না তা দেখতে। জাদিগের বাবা-মা-ই কেবল দুঃখিত হলেন, কেননা তারা জাদিগের সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছিলেন না। বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির চার ভাগের তিন ভাগ পেতে চলেছিলেন রাজা, এক ভাগ হিংসুক।

জাদিগ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময় রাজার হীরেমন পাখিটি অলিন্দ থেকে উড়ে জাদিগের বাগানের একচি গোলাপ ঝোপে গিয়ে বসল। পাশের একটা গাছ থেকে একটা পিচফল হাওয়ায় খসে পড়ছিল। ফলটি এক টুকরো কাগজের ওপর পড়ে তাতে সেঁটে গিয়েছিল। পাখিটি ফল আর সেই কাগজটি তুলে নিয়ে সম্রাটের কোলের ওপর গিয়ে বসল। কৌতূহলী রাজা কাগজটিতে কয়েকটি শব্দ পড়লেন, শব্দগুলোর কোনো মানে হয় না আর তা কবিতার চরণের শেষ অংশ বলে মনে হচ্ছিল। রাজা কবিতা ভালোবাসতেন আর যেসব রাজা কবিতা ভালোবাসেন তাদের মধ্যে সবসময় বোধবুদ্ধি থেকে যায় : হীরেমনের অদ্ভুত কাণ্ডে তিনি ভাবতে শুরু করলেন। জাদিগের কাগজের টুকরোটায় যা লেখা ছিল তা রানির মনে পড়ে গেল, তিনি তা আনালেন এবং কাগজের দুটো টুকরো পাশাপাশি রাখা হলো, টুকরো দুটি চমৎকার জোড়া লেগে যাচ্ছিল; তখন ঠিক যেভাবে জাদিগ লিখেছিলেন সেভাবে কবিতার চরণগুলো পড়া গেল :

"ভয়াবহ কীযে অনাচারে আলোড়িত দেখেছি ধরায়
সিংহাসনে দৃঢ় অবিচল, রাজা করে সমস্ত শাসন।
শান্তিময় জগৎসংসারে প্রেম শুধু যুদ্ধ করে যায় :
চিরশত্রু সেই তো কেবল আমাদের ত্রাসের কারণ।"

তৎক্ষণাৎ রাজা আদেশ দিলেন জাদিগকে তার সামনে নিয়ে আসা হোক এবং তার আর দুই বন্ধু এবং সুন্দরী মহিলাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। জাদিগ রাজা আর রানির পায়ের তলার মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন : একান্ত বিনীতভাবে খারাপ কবিতা লেখার জন্য তিনি তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন; এমন সুললিত ভাষায়, এমন চিন্তা আর যুক্তি দিয়ে তিনি কথা বলে গেলেন যে রাজা আর রানি আবার তার সাক্ষাৎ পেতে চাইলেন। আবার এসে তিনি রাজা আর রানিকে আরও বেশি প্রসন্ন করলেন। হিংসুক অন্যায়ভাবে তাকে অভিযুক্ত করেছিল বলে তার সমস্ত সম্পত্তি জাদিগকে দেওয়া হলো; কিন্তু জাদিগ সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন, আর হিংসুক সম্পত্তি না হারানোর আনন্দেই উৎফুল্ল হয়ে রইল। জাদিগের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়তে লাগল। নিজের সবরকম আমোদে তিনি জাদিগকে সঙ্গী করতেন আর সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতেন। তখন থেকে রানি জাদিগের দিকে এমন দাক্ষিণ্য ভরা দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন যে ঐ দাক্ষিণ্য রানির নিজের পক্ষে, তার মহামান্য স্বামী রাজার পক্ষে, জাদিগের পক্ষে, রাজ্যের পক্ষে এবং রাজার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। জাদিগ ভাবতে শুরু করলেন সুখী হওয়াটা কঠিন নয়।

মহৎ মানুষগুলো

পাঁচ বছর অন্তর বিরাট এক উৎসব অনুষ্ঠিত হতো—তার সময় এগিয়ে এলো। পাঁচ বছরের শেষে, নাগরিকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মহৎ কাজ করছেন, তার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হতো; এটা ছিল ব্যাবিলনের প্রথা। পুরোহিত আর গণ্যমান্যরা বিচারক হতেন। নগরপাল মুখ্য ক্ষত্রপ তার শাসনে সবচেয়ে ভালো যেসব কাজ হয়েছে তার বিবরণ দিতেন। পক্ষে আর বিপক্ষে মতামত জানানো হতো, রাজা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে লোকে এই অনুষ্ঠানে আসত। রাজার হাত থেকে বিজয়ী মূল্যবান পাথর বসানো একটি স্বর্ণপাত্র পেতেন। আর রাজা তাকে এই কথাগুলো বলতেন, 'মহত্ত্বের জন্য এই পুরস্কার গ্রহণ করুন, আর দেবতারা যেন আপনার মতো অনেক প্রজা আমায় দেন'।

সেই স্মরণীয় দিন উপস্থিত হলো। রাজা সিংহাসনের ওপর দেখা দিলেন, তাকে ঘিরে অভিজাতকুল, পুরোহিতরা আর সমস্ত জাতির প্রতিনিধিরা। তারা সবাই যেন প্রতিযোগিতায় হাজির হয়েছিলেন যেখানে ঘোড়ার জোরে ছোটার বা শারীরিক শক্তির পরিবর্তে গুণের সাহায্যে গৌরব অর্জন করতে হয়। মুখ্য ক্ষত্রপ উচ্চ কণ্ঠে কয়েকটি কাজের বিবরণ পেশ করলেন এবং সেগুলো যারা করেছেন ঐ কৃত কাজ তাদের ঐ অমূল্য পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা দিতে পারে। হৃদয়ের যে মহত্ত্বের বশে জাদিগ হিংসুকের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, মুখ্য ক্ষত্রপ তার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না, তা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতার বিচারে বিবেচিত হওয়ার মতো নয়।

মুখ্য ক্ষত্রপ প্রথমে একজন বিচারককে হাজির করলেন। ঐ বিচারক একবার শনাক্ত করাতে ভুল করায় একজন নাগরিক গুরুতর এক মামলায় হেরে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভুলের জন্য তিনি নিজে দায়ী ছিলেন না। লোকটিকে বিচারক নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন, ঐ সম্পত্তির দাম লোকটি যা হারিয়েছিল তার দামের সমান।

এরপর তিনি এক যুবককে নিয়ে এলেন। যুবকটি একটি মেয়ের প্রেমে মুগ্ধ। বিয়ে করতে গিয়েও সে মেয়েটিকে এক বন্ধুর হাতে সমর্পণ করল। বন্ধুটি ঐ

মেয়েটির প্রেমে মরতে বসেছিল। আর মেয়েটিকে তার বন্ধুর হাতে দান করার সময় যুবক তার যৌতুকের খরচও দিয়ে দিল।

তারপর তিনি এক সৈনিককে উপস্থিত করলেন। ঐ সৈনিক ইর্কানির যুদ্ধের সময় মহত্ত্বের আরও বড় দৃষ্টান্ত রেখেছিল। শত্রু-সৈন্যরা তার প্রেমিকাকে নিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের কবল থেকে সে প্রেমিকাকে বাঁচাচ্ছিল। লোকে এসে বলল সেখান থেকে কয়েক পা দূরে আরও সব ইর্কানীয়রা তার মাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে কাঁদতে কাঁদতে প্রেমিকাকে ছেড়ে মাকে উদ্ধার করতে ছুটল। এরপর যাকে সে ভালোবাসে তার কাছে এসে দেখল মেয়েটি মারা যাচ্ছে। লোকটি প্রাণ দিতে চাইল; তখন মা তাকে বোঝালেন যে সেই তার একমাত্র সম্বল, আর লোকটি সাহসের সঙ্গে নিজের দুঃখের জীবনকে বরণ করে নিল।

বিচারকরা সৈনিকের পক্ষে ঝুঁকলেন। রাজা তার বক্তব্য শুরু করে বললেন, 'সৈনিক আর অন্যান্যদের কাজ হৃদয়কে মুগ্ধ করে, কিন্তু তা আমায় এতটুকু অবাক করেনি। গতকাল জাদিগের একটি কাজ আমাকে অবাক করেছে। কয়েকদিন হলো, আমার মন্ত্রী আর প্রিয়পাত্র কোরবকে আমি পদচ্যুত করেছি। তার ওপর আমার বিরক্তির কথা আমি কঠোর ভাষায় বলতে যাচ্ছিলাম আর আমরা সভাসদরা আমায় জানিয়ে দিচ্ছেলেন যে আমি খুবই দয়ালু, অর্থাৎ কি না কে আমার কাছে কোরেবের নিন্দা করতে পারে তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছিল। এ ব্যাপারে জাদিগ কী বলেন আমি জানতে চাইলাম, আর তিনি নির্ভীকভাবে কোরেবের প্রশংসা করলেন। আমি স্বীকার করছি, আমাদের কাহিনিগুলোর মধ্যে আমি এমন উদাহরণ দেখেছি যেখানে মানুষ নিজের সম্পত্তি দিয়ে ভুলের মাশুল দিয়েছে। প্রেমিককে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে, ভালোবাসার পাত্রের বদলে মাকে বেছে নিয়েছে, কিন্তু সম্রাট যার ওপর বিরক্ত এমন পদচ্যুত কোনো মন্ত্রীর পক্ষ নিয়ে কোনো সভাসদ কিছু বলেছেন এমন কথা আমি কখনো শুনিনি। যাদের মহত্ত্বের বিররণ পেশ করা হলো তাদের প্রত্যেককে আমি বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, কিন্তু পুরস্কার পাত্র দিচ্ছি কেবল জাদিগকে।'

জাদিগ বললেন, 'প্রভু, মহামান্য সম্রাটই একমাত্র ঐ পাত্র পাওয়ার অধিকারী। আপনিই এমন কাজ করছেন, যা আর কখনো শোনা যায়নি, কেননা দাস যদিও আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে তবু রাজা হয়ে আপনি তার প্রতি বিরূপ হননি।'

লোকে রাজা আর জাদিগের গুণকীর্তন করল। যে বিচারক তার সথাসর্বস্ব দান করেছিলেন, যে প্রেমিক বন্ধুর হাতে নিজের প্রেমিককে সমর্পণ করেছিল, যে সৈনিক প্রণয়িনীর মুক্তির চেয়েও জননীর মুক্তি অধিক কাম্য বলে বিবেচনা করেছিল, তারা সবাই রাজার হাত থেকে পুরস্কার পেলেন, তাদের চোখের সামনে মহাপ্রাণদের গ্রন্থে তাদের নাম লেখা হলো; জাদিগ পেলেন পুরস্কার-পাত্র। রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের খ্যাতি অর্জন করলেন; সে খ্যাতি তিনি খুব বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। নিয়মমাফিক যা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে দীর্ঘ উৎসবে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে তোলা হলো। সেই উৎসবের স্মৃতি এশিয়া মাহাদেশে এখনও বেঁচে আছে।

জাদিগ বলতে লাগলেন, 'অবশেষে আমি তাহলে সুখী!'

কিন্তু তিনি ভুল করলেন।

মন্ত্রী

রাজা তার প্রধানমন্ত্রীকে হারিয়েছিলেন। ঐ পদ পূর্ণ করার জন্য তিনি জাদিগকে নির্বাচন করলেন। ব্যাবিলনের তাবৎ সুন্দরী এই নির্বাচনের তারিফ করল। কেননা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এমন তরুণ মন্ত্রী আর কখনো হয়নি। সভাসদরা সবাই ক্ষুব্ধ হলেন, হিংসুকের মুখ দিয়ে রক্ত বের হলো আর তার নাকটা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। রাজা আর রানিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জাদিগ হিরামন পাখির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলেন।

তাকে তিনি বললেন, 'সুন্দর পাখি, আমার প্রাণ বাঁচিয়ে তুমিই আমায় প্রধানমন্ত্রী করলে। মহামান্য রাজ-দম্পত্তির কুকুর আর ঘোড়া আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু তুমি আমার উপকার করেছ। মানুষের ভাগ্য তাহলে এমন নগণ্য জিনিসের ওপর নির্ভর করে।'

তিনি আরও বললেন, 'তবে এমন অদ্ভুত সুখ হয়তো অচিরেই মিলিয়ে যাবে।'

হীরামন জবাব দিল, 'ঠিক, ঠিক।'

কথাটা জাদিগকে আঘাত করল। তবে জাদিগ ছিলেন বিচক্ষণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী আর হীরামন পাখি ভবিষ্যদ্বক্তা হয় বলে তার বিশ্বাস ছিল না, ফলে অবিলম্বে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন আর মন্ত্রী হিসেবে নিজের কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করতে লাগলেন!

এভাবে জাদিগ প্রতিদিন তার প্রতিভার সূক্ষ্মতা এবং অন্তরের সহৃদয়তার পরিচয় দিতে লাগলেন; লোকে তাকে ভক্তি করত আর তা সত্ত্বেও ভালোবাসত। তাবৎ মানুষের মধ্যে তাকে সবচেয়ে ভাগ্যবান বলে গণ্য করা হতো। সাম্রাজ্যময় তার খ্যাতি, প্রতিটি নারী তার দিকে আড়চোখে তাকাত, প্রতিটি নাগরিক তার ন্যায়বিচারের জয়গান করত; জ্ঞানীরা তাকে তাদের দৈব নির্দেশের মতো মান্য করতেন, যাজকেরা পর্যন্ত স্বীকার করতেন যে তিনি বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত ইয়েবের চেয়ে জ্ঞানী। শ্যেন সিংহ নিয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা দূরে থাক তার কাছে যা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো একমাত্র তাই লোকে বিশ্বাস করত।

১৫০০ বছর ধরে ব্যাবিলনে প্রচণ্ড এক বিবাদ চলে আসছিল, আর ঐ বিবাদ সাম্রাজ্যকে দুটি গোঁড়া সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছিল। এক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যে মিত্র-দেবীর মন্দিরে আগে বাঁ পা ফেলে ঢুকতে হয়; অন্য সম্প্রদায় ঐ আচারকে ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করত আর আগে ডান পা না ফেলে মন্দিরে ঢুকত না। কোন সম্প্রদায় জাগিদের অনুগ্রহ লাভ করে তা জানার জন্য লোকে পবিত্র অগ্নিপূজার পুণ্য দিনের অপেক্ষা করতে লাগল। সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল জাদিগের দুই পায়ের ওপর; সমস্ত নগরী ব্যাকুল আর উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল। জাদিগ জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন, আর তারপর তিনি আবেগময় এক বক্তৃতায় বুঝিয়ে দিলেন, যিনি আকাশ ও ধরিত্রীর অধীশ্বর, যার কাছে কারও কোনো ভেদাভেদ নেই তিনি বাঁ পাকে ডান পায়ের চেয়ে গুরুত্ব দেয় না।

হিংসুক আর তার স্ত্রী বলে বেড়াতে লাগল যে, জাদিগের বক্তৃতায় যথেষ্ট অলংকার ছিল না, আর পাহাড়-পর্বতকে তিনি সেরকম নৃত্যচঞ্চল করে তুলতে পারেননি। তারা বলতে লাগল, 'ওর কোনো রসকস নেই, প্রতিভাও নেই। ওর বক্তৃতার মধ্যে সমুদ্রকে দূরে সরে যেতে বা তারাদের খসে পড়তে বা সূর্যকে মোমের মতো গলে যেতে দেখা যায় না; ওর বক্তৃতায় প্রাচ্যদেশের অপূর্ব সেই ভঙ্গিটিই নেই।'

জাদিগ যুক্তিপূর্ণ ভঙ্গিকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তার পথটা সঠিক অথবা তার কথা যুক্তিযুক্ত কিংবা তিনি ভালো লোক—এসব কারণ বাদ দিয়ে একমাত্র প্রধান উজির বলেই সবাই তার পক্ষ নিল।

তিনি সাদা পুরোহিত আর কালো পুরোহিতদের বিরাট বিরোধের সন্তোষজনক সমাধান করলেন। সাদারা বিশ্বাস করত ঈশ্বরের আরাধনা করতে গিয়ে শীতকালে প্রাচ্যের দিকে ঘোরাটা পাপ; কালোরা দাবি করত গ্রীষ্মকালে সূর্যের অস্তাচলনে দিকে মুখ করে মানুষের আরাধনায় ঈশ্বর নিতান্ত বিরূপ হন। জাদিগ নির্দেশ দিলেন যার যেদিকে খুশি ঘুরতে পারে।

এভাবে তিনি সকালে নিত্যনৈমিত্তিক আর বিশেষ বিশেষ কাজকর্মগুলো নিষ্পত্তি করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। দিনের বাকি সময়টা তিনি ব্যাবিলনে সুন্দর করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন; তিনি এমনকিছু বিয়োগান্ত নাটক মঞ্চস্থ করাতেন যাতে লোকে কাঁদত আর এমনকিছু মিলনান্তক নাটক অভিনয় করাতেন যাতে লোকে হাসত; অনেকদিন ধরে এ ব্যাপারটার আর চল ছিল না, আর তিরি ফের তার প্রচলন ঘটালেন কেননা তার রসবোধ ছিল। শিল্পীদের চেয়ে বেশি বোঝার দাবি তিনি করতেন না : তিনি তাদের উপকার আর সম্মান দ্বারা পুরস্কৃত করতেন এবং তাদের ক্ষমতার জন্য মনে মনে এতটুকু ঈর্ষা বোধ করতেন না। সন্ধ্যাবেলা তিনি রাজা আর বিশেষ করে রানির মনোরঞ্জন করতেন। রাজা বলতেন, 'মহান মন্ত্রী।' রানি বলতেন, 'সদাশয় মন্ত্রী। আর তারা দুজনে আরও বলতেন, 'এর ফাঁসি হয়ে গেলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হতো।'

উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কোনো পুরুষকে কখনো মহিলাদের এক অভিযোগের মীমাংসা করতে হয়নি। মহিলাদের বেশিরভাগ তাকে এমন সব ঘটনার কথা বলতে আসত যা তাদের জীবনে মোটেই ঘটেনি। তাদের অভিপ্রায় ছিল জাদিগের সঙ্গে একটা কিছু ঘটুক। যেসব মহিলা সবার আগে হাজির হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল হিংসুকের স্ত্রী। মিত্র-দেবের নামে, জেন্দ আবেস্তার নামে আর পবিত্র অগির নামে শপথ করে সে জানাল স্বামীর স্বভাব-চরিত্রে তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে; তারপর জাদিগের কাছে সে কবুল করল যে, তার স্বামী সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আর নিষ্ঠুর; সে তাকে বোঝাল পবিত্র অগ্নির যে মাহাত্ম্যে মানুষ দেবতার সমান হয়ে ওঠে সেই মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত করে ঈশ্বর তার স্বামীকে শাস্তি দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত মহিলা তার মোজার বাঁধনটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্ষান্ত হলো। সাধারণ ভদ্রতার বশে জাদিগ সেটা কুড়িয়ে দিলেন, কিন্তু তা মহিলার হাঁটুতে আবার পরিয়ে দিলেন না; আর এটাকে যদি ভুল বলে ভাবা যায় তাহলে এই সামান্য ভুল ভয়ানক অনর্থের কারণ

হয়ে দাঁড়াল। এ নিয়ে জাদিগ মাথা ঘামালেন না, কিন্তু হিংসুকের স্ত্রী খুবই মাথা ঘামালেন।

আরও সব মহিলা প্রতিদিন হাজির হতে লাগল। ব্যাবিলনের গোপন ইতিবৃত্ত অনুযায়ী একবারই তিনি মজেছিলেন, কিন্তু নিরাসক্তভাবে সম্ভোগ করে আর প্রেমিকাকে অন্যমনস্কভাবে চুম্বন করে তিনি নিজেই খুব অবাক হলেন। প্রায় নিজের অজান্তে যাকে তিনি অনুগ্রহের নিদর্শন দেখালেন, যেই নারী ছিল রানি আস্তার্তের এক সহচরী। কোমল স্বভাবের ঐ ব্যাবিলনবাসিনী নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য ভাবছিল : 'এই লোকটির মাথায় নিশ্চয় নানারকম বিষয়েচিন্তা ঘুরছে, কেননা সঙ্গম করতে করতেও লোকটি সেসব কথা ভেবে যাচ্ছে।'

যে মুহূর্তগুলোতে কিছু লোক একটি কথাও বলে না কিংবা অন্যেরা যখন পবিত্র সব কথাই কেবল উচ্চারণ করে তখন জাদিগের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'রানি!'

ব্যাবিলনবাসিনী ভেবে নিল অবশেষে যথাসময়ে জাদিগের চৈতন্য হয়েছে আর তিনি তাকে বলছেন, 'আমার রানি।'

অথচ তখনও অত্যন্ত অন্যমনস্ক জাদিগ আস্তার্তের নাম উচ্চারণ করলেন। মহিলা তার এই সুখকর পরিস্থিতিতে সবকিছুই নিজের সুবিধামতো মানে করে নিচ্ছিল; সে ভেবে নিল এর অর্থ : 'তুমি রানি আস্তার্তের চেয়েও সুন্দরী।'

জাদিগের অন্দরমহল থেকে মহিলা বের হয়ে এলো, সঙ্গে চমৎকার সব উপহার। নিজের প্রেমের গল্প সে হিংসুকের স্ত্রীকে শোনাতে গেল। হিংসুকের স্ত্রী ছিল তার প্রাণের বন্ধু; জাদিগের পছন্দে হিংসুকের স্ত্রীর খুবই জ্বালা হলো।

সে বলল, 'আমার মোজার বাঁধনটা দেখ, শুধু একটিবার আমার বাঁধনটা পরিয়ে দিতেও সে চাইল না, আমি এটা আর পরতে চাই না।'

ভাগ্যবতী নারীটি হিংসুকের স্ত্রীকে বলল, 'আরে! রানি আর তুমি দেখছি একই রকম বাঁধন পর! তোমরা তবে এক বাঁধনওয়ালীর কাছ থেকে বাঁধনা কেন?'

হিংসুকের স্ত্রী একমনে ভাবতে লাগল, আর কোনো জবাব না দিয়ে স্বামী হিংসুকের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল।

ইতোমধ্যে জাদিগ লক্ষ করছিলেন সে অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে শুনতে বা বিচার করতে গিয়ে সবসময় তার মনে আরও নানারকম চিন্তার উদার হয়; এর কারণটা কী তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না: এটাই ছিল তার একমাত্র কষ্ট।

তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন : তাঁর মনে হলো, প্রথমে শুকনো ঘাসের ওপর তিনি শুয়ে রয়েছেন, তার ভেতর কিছু কাটা ঘাস তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, আর এর পর গোলাপের একটি বিছানায় তিনি আরামে এলিয়ে আছেন, ঐ বিছানা থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসছে আর তার বুকে তীক্ষ্ণ আর বিষাক্ত জিব দিয়ে ক্ষত করে দিচ্ছে।

তিনি বলতে লাগলেন, 'হায়রে! অনেকদিন আমি ঐ বিঁধতে থাকা শুকনো ঘাসের উপর শুয়েছিলাম, এখন আমি রয়েছি গোলাপের বিছানায়; কিন্তু সাপটা কী হতে পারে?'

সন্দেহ

জাদিগের সৌভাগ্য, বিশেষ করে যোগ্যতাই তার দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনল। প্রতিদিন রাজা আর মহামান্য পত্নী আস্তার্তের সঙ্গে জাদিগ কথা বলতেন। পরিশীলিত অন্তরে আনন্দ দেওয়ার ইচ্ছা সৌন্দর্যে অলংকারের মতো তার আলাপের আকর্ষণকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিত; তার রূপ, যৌবন আস্তার্তের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, আস্তার্তে নিজেও তো প্রথমে বুঝতে পারেননি। নিষ্পাপ সাফল্যের বুকে ভালোবাসার আবেগ বেড়ে উঠতে থাকল। নির্ভয়ে আর নিঃসঙ্কোচে আস্তার্তে তার স্বামী আর সারা রাজ্যের প্রিয় মানুষটির দেখা পেয়ে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তার কথা শুনতে চাইতেন; রাজার কাছে তিনি সারাক্ষণ জাদিগের গুণকীর্তন করতেন; সহচরীদের কাছেও তিনি তাই করতেন প্রশস্তিতে সহচরীরা তাকে ছাড়িয়ে যেত, সবকিছু মিলে যে তার মনে গভীর দাগ কাটছিল তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। জাদিগকে তিনি এটা-সেটা উপহার দিতেন, সেসব উপহারে যতটা অনুরাগ সঞ্চারিত হতো ততটা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তার ধারণা ছিল, জাদিগের সঙ্গে তিনি শুধু কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন কিন্তু তিনি রানির মতো কথা বলছেন, অথচ কখনো কখনো তার মধ্যে আবেগ-বিহ্বল নারীর ভাবভঙ্গি দেখা দিত।

কানাদের যে ঘৃণা করত সেই সেমির বা স্বামীর নাক যে কাটতে চেয়েছিল সেই আরেকজন নারীর চেয়ে আস্তার্তে অনেক বেশি রূপসি ছিলেন। কথা বলতে গিয়ে আস্তার্তে লজ্জায় লাল হতে শুরু করেছিলেন, নিজের দৃষ্টি তিনি ঘুরিয়ে নিতে চাইতেন এবং তা জাদিগের দৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকত; আর আস্তার্তের অন্তরঙ্গতা, তার

আবেগভরা ভাষা এবং দৃষ্টি জাদিগের অন্তরে প্রেমের এক আগুন জ্বালিয়ে দিত, এতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, যা তাকে চিরকাল উদ্ধার করেছে সেই দর্শনের সাহায্য কামনা করলেন, দর্শন থেকে তিনি কেবল জ্ঞানের আলো লাভ করলেন কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। কর্তব্য, কৃতজ্ঞতাবোধ বা সম্রাটের মর্যাদার অবমাননা তার চোখের সামনে প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতার মতো দেখা দিতে লাগল; তিনি বুঝতে থাকলেন, জয়ী হতে লাগলেন, অথচ বারেবারে নতুন করে জয়ী হওয়ার মাশুল হিসেবে তাঁকে দিতে হচ্ছিল যন্ত্রণার আর্তি আর চোখের জল। আগেকার মতো রানির সঙ্গে তাদের উভয়ের কাছে আকর্ষণীয় মাধুর্যে ভরা সেই খোলামেলা আলোচনা করতে জাদিগের আর সাহস হতো না : তার চোখ দুটি বাষ্পে ভরে যেত; তার কথা আড়ষ্ট আর অসংলগ্ন হয়ে উঠত; তিনি চোখ নামিয়ে নিতেন; আর, যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি আস্তার্তের দিকে ঘুরে যেত তখন তাঁর নজরে পড়ত রানির অশ্রুসজল চোখ, সে চোখ থেকে যেন আগুনের শিখা ঠিকরে পড়ছে, মনে হতো দুজনে পরস্পরকে যেন বলছেন, 'আমরা একে অন্যের অনুরক্ত হয়েও পরস্পরকে ভালোবাসতে ভয় পাচ্ছি, দুজনেই আমরা প্রেমের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি আর সেই প্রেমের ওপর দোষ চাপাচ্ছি।'

দিশেহারা, বিহ্বল অবস্থায় জাদিগ রানির কাছ থেকে বিদায় নিতেন, তার বুকের ভিতর এমন একটা ভার চেপে থাকত যে তিনি আর বইতে পারছিলেন না। একটা লোক অনেকদিন ধরে তীব্র যন্ত্রণার কষ্ট সহ্য করে, তারপর দ্বিগুণ বেড়ে উঠা তীক্ষ্ণ ব্যথায় বেরিয়ে আসে আর্তনাদে আর কপালে গড়িয়ে পড়া শীতল ঘামে সে তার যন্ত্রণাটা জানিয়ে দেয়; ঠিক তেমনিভাবে জাদিগ এক প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে তার গোপন কথা বন্ধু কাদরকে বলে ফেললেন।

কাদর তাকে বললেন, যে অনুভব তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে তা আগেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি; প্রেমের কিছু লক্ষণ আছে, লোকে তাকে অন্য কিছু বলে ভুল করে না। বন্ধুবর, ভেবে দেখ আমি যেখানে তোমার হৃদয়ের খবর জেনে ফেলেছি সেখানে রাজার কাছে কষ্টকর অনুভবটা তিনি কি তোমাদের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবেন না? রাজা নিতান্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক, এছাড়া তার আর কোনো দোষ নেই। যতখানি শক্তি দিয়ে তুমি তোমার প্রেমের আবেগ প্রতিহত করেছ, রানি তার আবেগের সঙ্গে ততটা খুঁজতে পারবেন না, কেননা তুমি হলে দার্শনিক, তুমি হলে জাদিগ। আস্তার্তে নারী, তিনি নিজেকে এখনও ততটা দোসী বলে বিবেচনা করেন না, তাঁর চোখের চাউনিকে অসতর্কভাবে অনেক বেশি প্রকাশ করতে দেন। দুর্ভাগ্যবশত নিজেকে নিরপরাধ ভেবে প্রয়োজনীয় বাহ্যিক হাবভাবগুলোকে তিনি নিশ্চিন্তচিত্রে উপেক্ষা করেন। তাকে দোষ দেওয়া যায় এমন একটা কিছু না ঘটা পর্যন্ত আমি ভয়ে ভয়ে থাকব। দুজনের বোঝাপড়া থাকলে তোমরা সবার চোখে ধুলো দিতে শিখতে। সদ্য জেগে ওঠা আর যুঝতে থাকা প্রেমের আবেগ ফেটে বেরিয়ে পড়ে, তৃপ্ত প্রেম লুকিয়ে থাকতে জানে।'

উপকারী রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাবে জাদিগ শিউরে উঠলেন। অনিচ্ছাকৃত কোনো অপরাধে রাজার কাছে অপরাধী হয়ে থাকার দরুন তিনি যারপরনাই রাজার অনুগত হয়ে উঠলেন। এদিকে রানি এমন ঘন ঘন জাদিগের নাম উচ্চারণ করেন, সেই নাম উচ্চারণ করার সময় তার কপাল এমন আরক্ত হয়ে ওঠে, রাজার উপস্থিতিতে জাদিগের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কখনো তিনি এমন চপল কখনো এমন বিহ্বল হয়ে পড়েন, জাদিগ বিদায় নিয়ে স্বপ্নের ঘোর তাকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে রাজার মনে চিন্তার উদায় হয়। যা কিছু চোখে পড়ে তাই তিনি বিশ্বাস করেন। যা দেখতে পান না মনে মনে তা ভেবে নেন। তার নজরে পড়ল তার স্ত্রীর চটি নীল, তার স্ত্রীরি চুলের ফিতে হলুদ আর জাদিগের ফেজ হলুদ। দুর্বলচিত্ত রাজার কাছে এসমস্তই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত। বিষিয়ে ওঠা অন্তরে সন্দেহ স্থির বিশ্বাসে পরিণত হলো।

রাজরানিদের দাসদাসীরা সব তাদের হৃদয়ের ও গুপ্তচর। অচিরে লোকে সন্ধান পেল, আস্তার্তে মজেছেন আর মোয়াবদারের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। হিংসুক তার স্ত্রীকে মোজার বাঁধনটা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিল, বাঁধনটা দেখতে রানির বাঁধনের মতো। দুর্বিপাক ঘনিয়ে তোলার জন্য বাঁধনটা ছিল নীল। প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় ছাড়া আর কিছুই রাজার মাথায় এলো না। একদিন রাতের বেলা তিনি সাব্যস্ত করলেন, রানিকে বিষ খাওয়াবেন আর দিনের আলো দেখা দিলেই জাদিগকে ফাঁস পরিয়ে মারবেন। তার ভার দেওয়া হলো নির্মম এক খোজাকে। ঐ খোজাই রাজার প্রতিহিংসার হুকুম তামিল করত। রাজার শোয়ার ঘরে ক্ষুদে একটা বামন উপস্থিত ছিল, বামনটি ছিল বোমা ঠিকই, তবে কালো নয়। তার উপস্থিতি নিয়ে কেউ কখনো আপত্তি করত না; সবচেয়ে গোপনে যা কিছু ঘটত গৃহপালিত

জন্তুর মতো সে তার সাক্ষী হয়ে থাকত। এই খুদে বোবাটি ছিল রানি আর জাদিগের একান্ত অনুগত। যতখানি বিস্ময় ঠিক ততটা আতঙ্ক নিয়ে সে তাদের মৃত্যুর আদেশ শুনতে পেল। ঐ ভয়াবহ হুকুম অল্প কয়ের ঘণ্টার মধ্যে তামিল হতে চলেছে, কিন্তু কীভাবে তাদের এ সম্পর্কে সাবধার করে দেওয়া যায়? বামনটা কিছুই লিখতে জানত না, তবে সে ছবি আঁকতে শিখেছিল, আর বিশেষ করে ছবিতে সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে পারত। রানিকে যা জানাতে চাইছিল তা আঁকতে আঁকতে রাতের কিছুটা সময় সে কাবার করে দিল। তার রেখাচিত্রে ছিল ভয়ঙ্কর রাগে অস্থির রাজা খোজাকে হুকুম দিচ্ছেন, একটি টেবিলের ওপর নীল একটি দড়ি আর পাত্র, সঙ্গে নীল রঙের মোজার বাঁধন আর হলুদ ফিতে; ছবির মাঝখানে রানি মারা যাচ্ছেন—সহচরীরা তাকে জড়িয়ে ধরেছে; রানির পায়ের কাছে শ্বাসরুদ্ধ জাদিগ। দিগন্তে রয়েছে উদীয়মান সূর্য, বোঝানো হচ্ছে ভোরের প্রথম সূর্যালোকে ঐ ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটতে চলেছে। ছবিটা শেষ করেই সে ছুটকে ছুটতে আস্তার্তের এর সহচরীর ঘরে উপস্থিত হয়ে তার ঘুম ভাঙল, আর তাকে বুঝিয়ে দিল যে, ছবিটি সেই মুহূর্তে রানিকে পৌঁছে দিতে হবে।

এদিকে মাঝরাতে জাদিগের দরজায় ঘা দিয়ে জাদিগকে ঘুম থেকে তোলা হলো। তার হাতে রানির একটা চিরকুট দেওয়া হলো; ব্যাপারটা স্বপ্ন কি না জাদিগের সন্দেহ হলো; তিনি কম্পিত হাতে চিরকুট খুললেন। তার বিস্ময়ের কোনো সীমা রইল না, আর তাতে লেখা এই কথাগুলো পড়ে যে হতাশা—তার মনোকষ্টে তিনি ভেঙে পড়লেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না:

এই মুহূর্তে আপনি পালান নয়তো ওরা আপনার প্রাণ ছিনিয়ে নেবে।

জাদিগ পালিয়ে যান, আমাদের ভালোবাসা আর আমার হলুদ ফিতের দিব্যি দিয়ে আপনাকে পালিয়ে যেতে আদেশ দিচ্ছি। আপনার কোনো দোষ ছিল না; বুঝতে পারছি আমি তবু অপরাধী হিসেবে প্রাণ হারাব।

জাদিগের প্রায় কথা বলারই শক্তি ছিল না। তিনি কাদরকে ডেনে আনতে আদেশ দিলেন এবং কোনো কথা না বলে তার হাতে চিরকুটটি দিলেন। কাদর জোর করে তাকে ঐ আদেশ মেনে তৎক্ষণাৎ মেমফিসের পথে রওনা হতে বাধ্য করলেন।

জাদিগকে তিনি বললেন, 'তুমি যদি দুঃসাহস দেখিয়ে রানিকে খুঁজতে যাও তাহলে তুমি তার মৃত্যু ডেকে আনবে আর তুমি যদি রাজার সঙ্গে কথা বলো তাহলে তুমি রানিকে অবশ্যই হারাবে। তার কপালের ভার আমি নিলাম, তুমি নিজের অদৃষ্টকে অনুসরণ কর। আমি রটিয়ে দেব তুমি ভারতবর্ষের পথে গেছ। শীঘ্রই আমি তোমার খোঁজে যাব আর ব্যাবিলনে কী ঘটে, তোমাকে জানাব।'

সেই মুহূর্তে কাদর সবচেয়ে দ্রুতগামী দুটি উট প্রাসাদের এক গুপ্ত দরজার কাছে এনে রাখলেন। জাদিগ প্রাণ দিতেই চাইছিলেন, তাকে বয়ে আনতে হলো। কাদর তাকে উটের পিঠে তুলে দিলেন। জাদিগের সঙ্গে গেল একটিমাত্র ভৃত্য, আর অবিলম্বে বিস্ময় এবং বেদনায় মুহ্যমান কাদর তার বন্ধুকে আর দেখতে পেলেন না।

ঐ মহান পলাতক এক পাহাড়ের ধারে এসে উপস্থিত হলেন, সেখান থেকে ব্যাবিলন নজরে পড়ে। রানির প্রাসাদের দিকে ঘুরেফিরেই জাদিগ জ্ঞান হারালেন। শুধুমাত্র চোখের জল ফেলা আর মৃত্যু কামনা করার জন্য তার জ্ঞান ফিরে এলো। জগতের প্রধান রানি আর সবচেয়ে কোমলস্বভাব নারীর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মুহূর্তের জন্য সম্বিত ফিরে পেয়ে তিরি বলে উঠলেন, 'মানুষের জীবনটা তাহলে কী? ধর্মনিষ্ঠা তুমি আমার কোন কাজে লাগলে? দুটি নারী অন্যায়ভাবে আমার প্রবঞ্চনা করল, তাদের চেয়ে সুন্দরী আর সম্পূর্ণ নিরপরাধ তৃতীয় জন প্রাণ হারাতে যাচ্ছে! যা কিছু সৎকাজ আমি করেছি, চিরকাল তা আমায় অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর দুর্ভাগ্যের ভয়ঙ্কর খাদের ভেতর পড়ার জন্যই গৌরবের শিখরে আমার উত্থান। আরও অনেকের মতো অসৎ হলে আমি হয়তো তাদের মতো সুখী হতে পারতাম।'

এ সমস্ত মর্মান্তিক দুর্ভাবনায় মুহ্যমান জাদিগ মিশরের পথে চলতে লাগলেন: বেদনার আবরণে আচ্ছন্ন তার দৃষ্টি, মুখের পাণ্ডুরতা আর ঘনঘোর চূড়ান্ত হতাশার অতলে তলিয়ে যাওয়া তার অন্তর।

প্রহৃত নারী

জাদিগ নক্ষত্র দেখে নিজের গতিপথ নির্ধারণ করছিলেন। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী ও উজ্জ্বল লুব্ধক তারকা তাকে পথ দেখিয়ে কানোপ বন্দরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আলোর বিপুল মণ্ডলগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওরা আমাদের চোখে ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ বলে বোধ হয়, অথচ সৃষ্টির মধ্যে যা একটি অদৃশ্য বিন্দু ছাড়া আর

কিছুই নয়, সেই পৃথিবী আমার লালসার কাছে এমন বিরাট, এমন মহৎ আকার ধারণ করে। মানুষ যে সত্যি কী তখন তা তিনি ভাবতে লাগলেন। কাদর একটি অণুর ওপর কতকগুলো কীট পরস্পরকে গিলে খাচ্ছে। যথার্থ এই ছবিটা তার সামনে ব্যাবিলন আর তার নিজের অস্তিত্বের শূন্যতা তুলে ধরে তার দুঃখকে যেন লুপ্ত করে দিচ্ছিল। তার মন অসীম পর্যন্ত ছুটে গেল আর ইন্দ্রিয়ের বোধ থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অমোঘ নিয়ম সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকল। অথচ এর পর সম্বিত ফিরে পেয়ে আর নিজের অন্তরের ভেতর ফিরে এসে তিনি যখন ভাবতে লাগলেন যে, হয়তো আস্তান্তে তার প্রাণ হারিয়েছ তখন তার চোখের সামনে বিশ্বসংসার মিলিয়ে যাচ্ছিল আর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখী আস্তার্তে আর হতভাগ্য জাদিগকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

এভাবে মহৎ দর্শন এবং তীব্র বেদনার উচ্ছ্বাস আর প্রতি উচ্ছ্বাসে মগ্ন হয়ে জাদিগ মিশরের সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ইতোমধ্যে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রথম গঞ্জটিতে একটি বাসস্থানের খোঁজে গিয়েছিল। জাদিগ তখন গ্রামের ধারঘেঁষা বাগানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বড় রাস্তার কাছাকাছি একটি স্ত্রীলোককে তিনি দেখতে পেলেন, স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে দেবতা আর মানুষকে তাকে রক্ষা করতে ডাকছিল আর রাগে জ্ঞানশূন্য একটি লোক তার পেছনে ছুটছিল। ইতোমধ্যে লোকটি স্ত্রীলোকটিকে ধরে ফেলল। স্ত্রীলোকটি লোকটির পা জড়িয়ে ধরেছিল। লোকটি গালিগালাজ দিয়ে মারতে মারতে তাকে প্রায় আধমরা করে ফেলছিল। ঐ মিশরীয়টির নৃশংসতা আর স্ত্রীলোকটির বারবার ক্ষমা চাওয়া থেকে জাদিগ ধরে নিলেন ওদের একজন সন্দেহপরায়ণ অন্যজন অসতী; তবু জাদিগ স্ত্রীলোকটিকে ভালো করে লক্ষ করলেন—মন ভোলানো তার রূপ, এমনকি তাকে দেখতে কিছুটা দুঃখিনী আস্তার্তের মতো, দেখে জাদিগের মনে স্ত্রীলোকটির প্রতি গভীর সমবেদনা এবং ঐ মিশরীয়ের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জেগে উঠল।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে জাদিগকে বলল, 'আমায় বাঁচান, সবচেয়ে পাষণ্ড এই লোকটার কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন, আমার প্রাণ বাঁচান।'

এই আর্তনাদে জাদিগ ঐ স্ত্রীলোক আর পাষণ্ডের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে গেলেন। তিনি একটু-আধটু মিশরীয় ভাষা জানতেন। লোকটিকে তিনি এই কথাগুলো বললেন, 'তোমার যদি কিছুমাত্র মুনষ্যত্ব থাকে তাহলে আমি তোমার রূপ আর কোমলতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি। প্রকৃতির ঐ অপূর্ব সৃষ্টি তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে আর চোখের জল ছাড়া আত্মরক্ষার যখন কোনো উপায় নেই, তখন কী করে তাকে তুমি এমন লাঞ্ছনা দিচ্ছ?'

উত্তেজিত লোকটি বলল, 'আঃ! তুইও তবে ওর প্রেমে পড়েছিস? তাহলে তোর ওপরই প্রতিশোধ নিতে হয়।'

এক হাতে সে মহিলার চুল চেপে ধরেছিল, কথাটা বলে সে তাকে ছেড়ে দিল আর বর্শা হাতে ঐ ভিনদেশি লোকটাকে বিদ্ধ করতে গেল। জাদিগ তার স্থৈর্য হারায়নি, তাই সহজেই তিনি রাগে উন্মাদ লোকটির আঘাত এড়িয়ে গেলেন। বর্শার ফলার কাছটা তিনি ধরে ফেললেন। একজন চায় বর্শাটা টেনে নিতে অন্যজন চায় কেড়ে নিতে। দুজনের হাতের মাঝখানে বর্শা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। মিশরীয়টি তার তরবারি বের করল, জাদিগও নিজের তরবারি নিয়ে সশস্ত্র হলেন। তারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ও একশো ক্ষিপ্ত আঘাত হানে, তিনি তা কৌশলে আটকে দেন। মহিলাটি ঘাসের ওপর খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে তাদের দেখতে থাকে। মিশরীয়টি তার প্রতিপক্ষের চেয়ে স্বাস্থ্যবান। জাদিগ অধিক কুশলী। জাদিগ লড়াই করেন যে মানুষের মাথা হাতকে চালায় তার মতো আর একজন ক্ষিপ্তের মতো লড়তে থাকে, তার অস্থির গতিতে চালিত করে অন্ধ ক্রোধ। জাদিগ লোকটিকে পরাস্ত করে নিরস্ত্র করলেন মিশরীয়টি তখন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, লোকটিকে তিনি ধরে ফেললেন, চাপ দিতে লাগলেন, বুকের ওপর তরবারি ঠেকিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। জাদিগ তার প্রাণভিক্ষা দিতে চাইলেন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নিজের ছুরি বার করল। বিজয়ী জাদিগ যখন লোকটিকে ক্ষমা করতে যাবেন তখন সে জাদিগকে ছুরির আঘাতে আহত করল। ক্রুদ্ধ জাদিগ লোকটির বুকে তরবারি বসিয়ে দিলেন, বিকট এক আর্তনাদে ছটফট করতে করতে মিশরীয়টি মারা গেল।

মহিলাটির কাছে গিয়ে জাদিগ বিনীত স্বরে বললেন, 'ওই আমাকে প্রাণ নিতে বাধ করল : আপনার হয়ে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি, এমন নৃশংস লোক আমি জীবনে দেখেনি, তার হাত থেকে আপনি নিস্তার পেলেন, এখন আমার কাছে আপনি কী চান, বলুন?'

তার কথার জবাবে স্ত্রীলোকটি বলল, 'মর তুই, শয়তান, মর। আমার ভালোবাসার মানুষকে তুই মেরে ফেললি, পারলে তোর কলজেটা আমি টুকরো টুকরো করতাম।'

জাদিগ তার কথার উত্তর দিলেন, 'সত্যি অদ্ভুত ছিল আপনার ঐ ভালোবাসার মানুষটা। গায়ের সবটা জোর দিয়ে সে আপনাকে মারছিল। আপনি আমাকে বাঁচাতে বলায় সে আমার প্রাণ নিতে চেয়েছিল।'

চিৎকার করে মহিলা বলে যেতে লাগল, 'সে আমাকে আরও মারলেই ভালো হতো, মার খাওয়াই আমার উচিত, আমিই তার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিলাম। ঈশ্বর যদি এমন করতেন যে, সে আমায় মারত আর তুই তার জায়গা নিতিস।'

জাদিগ যতটা অবাক আর ক্রুদ্ধ হলেন তেমনটি জীবনে আর কখনো হননি। তিনি বললেন, 'যতই আপনি সুন্দরী হোন না কেন, এমন অদ্ভুত আপনার স্বভাব যে এবার আমার হাতেই আপানার মার খাওয়া উচিত। কিন্তু সে কষ্টটা আমি করছি না।'

এ কথা বলে তিনি উটের পিঠে চেপে গঞ্জের দিকে রওনা হলেন। কয়েক পা এগোতেই না এগোতে ব্যাবিলন থেকে আসা চারজন চরের কলরবে তিনি ফিরে তাকালেন। ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে ওরা আসছিল।

ওদের একজন স্ত্রীলোকটিকে দেখে বলে উঠল, 'ঐ তো সেই! চেহারার যে বর্ণনা আমাদের দেওয়া হয়েছে, ওর সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে।'

মৃত লোকটিকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তৎক্ষণাৎ তারা মহিলাটিকে ধরে ফেলল। স্ত্রীলোকটি তখন একনাগাড়ে চিৎকার করে জাদিগকে বলতে লাগলেন, 'মহান ভিনদেশি, আর একটিবার আমায় বাঁচান, আপনাকে দোষারোপ করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, আমায় বাঁচান আর আমি আজীবন আপনার অনুগত হয়ে থাকব।'

ঐ স্ত্রীলোকটির জন্য আবার লড়াই করার বাসনা জাগিদের ছিল না। তিনি জবাব দিলেন, 'অন্য কাউকে বলো, আমাকে আর ভোলাতে পারবে না।'

তাছাড়া তিনি আহত হয়েছিলেন, তার রক্ত পড়েছিল, তার শুশ্রূষার দরকার হয়ে পড়েছিল; এবং রাজামোয়াবদারের পাঠানো চারজন চরকে দেখে তিনি হয়তো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলেন। ব্যাবিলনের চারজন চর কী কারণে ঐ এক মিশরীয় স্ত্রীলোকটিকে ধরতে এলো সেটা তার মাথায় এলো না, তবে তিনি আরও অবাক হলেন ঐ মহিলার চরিত্রে।

দাসত্ব

মিশরীয় জনপদে ঢুকতেই লোকজন জাদিগকে ঘিরে ধরল। প্রত্যেকে চিৎকার করতে লাগল, 'এই লোকটিই সুন্দরী মিসুফকে চুরি করেছে আর ক্লেতোফিসকে এইমাত্র খুন করেছে।'

জাদিগ বললেন, 'মহাশয়রা, আপনাদের সুন্দরী মিসুফকে ভুলেও চুরি করা থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। তার মর্জির অন্ত নেই, আর ক্লেতোফিসের ব্যাপারে বলতে পারি, তাকে আমি মোটেই খুন করেনি, আমি তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছি। সে আমায় মারতে চেয়েছিল, কারণ সে সুন্দরী মিসুফকে নিষ্ঠুরভাবে মারছিল, আমি তাকে খুবই বিনীতভাবে স্ত্রীলোকটিকে দয়া করতে বলেছিলাম। আমি বিদেশি, মিশরে একটা থাকার জায়গা খুঁজতে এসেছি; আর আপনাদের কাছে আশ্রয় চাইতে এসে শুরুতেই আমি একটি স্ত্রীলোককে চুরি করব আর একটি লোককে খুন করব এটা সম্ভব নয়।'

সেকালে মিশরীয়দের মধ্যে ন্যায়বোধ এবং মনুষ্যত্ব ছিল। জাদিগকে ওরা নগরসভায় নিয়ে গেল। প্রথমে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হলো, তারপর প্রকৃত ঘটনাটা কী তা জানার জন্য তাকে এবং তার ভৃত্যকে আলাদভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। বোঝা গেল জাদিগ কোনোমতেই খুনি নন; তবে তিনি মানুষের রক্তপাত ঘটানোর অপরাধে অপরাধী; আইন অনুযায়ী তাকে ক্রীতদাস হওয়ার শাস্তি দেওয়া হলো। তার উট দুটি বিক্রি করা হলো, টাকাটা পাবে জনপদ। তার সঙ্গে আনা সমস্ত সোনা-দানা জনপদের বাসিন্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো। বিক্রির জন্য তাকে সশরীরে বড় চকে লোকের চোখের সামনে রাখা হলো, সঙ্গে রইল তার ভ্রমণসঙ্গী। সেতক নামে এক আরব বণিক তাদের নিলামে কিনে নিলেন; তবে বেশি খাটাখাটির উপযুক্ত বলে খানসামা তার মনিবের চেয়ে চড়া দামে বিক্রি হলো। দুজনের মধ্যে কোনো বাছবিচার করা হলো না। ফলে জাদিগ তার খানাসামার অধীন ক্রীতদাস হলেন : একসঙ্গে পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় তারা আরব বণিকের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। পথে জাদিগ তার চাকরকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন;

তবে নিজের স্বভাব অনুযায়ী মানুষের জীবন সম্পর্কে তিনি কিছু মন্তব্য করতে লাগলেন। ভৃত্যটিকে তিনি বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার দুর্ভাগ্য তোর ভাগ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে, এ যাবৎ আমার সমস্ত ব্যাপারই অদ্ভুতভাবে ঘটে গেছে। একটা মাদি কুকুরকে যেতে দেখার শাস্তি হিসেবে আমার জরিমানা হলো। শ্যেন সিংহের জন্য আমি তো প্রায় শূলে চড়াত যাচ্ছিলাম; রাজার প্রশস্তি করে কবিতা লেখার ফলে আমাকে মশানে পাঠানো হচ্ছিল; রানির চুলের ফিতে হলুদ হওয়ায় আমাকে গলা টিপেই মারা হচ্ছিল, আর একটা বর্বর প্রেমিকাকে মারছিল বলে বর্তমানে তোর সঙ্গে আমিও ক্রীতদাস। সাহস হারালে আমাদের চলবে না, হয়তো এসবের ইতি হবে, আরব বণিকদের অবশ্যই ক্রীতদাসের দরকার রয়েছে আর অন্য সবাইয়ের মতো আমিও বা ক্রীতদাস হতে পারব না কেন, যখন অন্য সবাইয়ের মতো আমিও মানুষ। এই বণিকটি নিষ্ঠুর হবে না; ক্রীতদাসের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হয়।'

এসব কথা তিনি বলে যাচ্ছিলেন আর তার হৃদয়ের গভীরে ব্যাবিলনের রানির কপালে কী ঘটল সেই চিন্তাটা আলোড়িত হচ্ছিল।

দুদিন বাদে সেতক তার ক্রীতদাস আর উটগুলো নিয়ে আরবের মরুভূমির দিকে যাত্রা করলেন, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা বাস করত ওবের-এর মরুভূমির কাছে। পথ দীর্ঘ আর কষ্টসাধ্য। পথে সেতক মনিবের চেয়ে খানসামার অনেক বেশি তারিফ করলেন; কেননা শেষের জন উটের পিঠে মাল বোঝাই করায় অনেক বেশি দক্ষ ছিল; আর যা একটু খাতির সেই পেল।

ওবের থেকে দু-দিনের পথে একটি উট মরে গেল, তার মালপত্র ক্রীতদাসদের সবার পিঠে ভাগ করে তুলে দেওয়া হলো; জাদিগকে ও তার নিজের ভাগ নিতে হলো। ক্রীতদাসরা সবাই নুয়ে পড়ে হাঁটছে দেখে সেতক হাসতে লাগলেন।

জাদিগ তার কাছে নিঃসঙ্কোচে এর কারণ ব্যাখ্যা করে সে তাকে ভারসাম্যের নিয়ম বুঝিয়ে দিলেন। বিস্মিত বণিক জাদিগকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলেন। বণিকের কৌতূহল জাগাতে পেরেছেন দেখে জাদিগ তার ব্যবসা-বাণিজ্য অজানা নয় এমন অনেক জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে বণিকের কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন, তিনি বোঝালেন সমান মাপের নানারকম ধাতু আর বস্তুর আপেক্ষিপ গুরুত্ব, কিছু কিছু উপকারী প্রাণীর ধর্ম, কাজে লাগে না এমন প্রাণীকে কী করে কাজে লাগানো যায়, শেষ পর্যন্ত সেতকের ধারণা হলো, জাদিগ একজন মহাজ্ঞানী। জাদিগের সঙ্গীকে তিনি খুবই কদর করেছিলেন, এবার জাদিগকে তিনি তার চেয়ে বেশি মর্যদা দিলেন। জাদিগের সঙ্গে তিনি সৎ ব্যবহার করতে লাগলেন আর এর জন্য তাকে পস্তাতে হলো না।

জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ফিরে এসে সেতক প্রথমেই একজন ইহুদির কাছে পাঁচশ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত চাইলেন। দুজন সাক্ষীর সামনে ঐ অর্থ তিনি ইহুদিটিকে ধার দিয়েছিলেন; কিন্তু সাক্ষী দুজন মারা যাওয়ায় আর অন্য কোনো প্রমাণ ছিল না; ফলে ইহুদিটি একজন আরবকে ঠকানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বণিকের টাকা আত্মসাৎ করল। জাদিগ হয়ে উঠেছিলেন সেতকের মন্ত্রণাদাতা, তার কাছে সেতক নিজের দুঃখের কথা জানালেন। জাদিগ জিজ্ঞেস করলেন কোন জায়গায় ঐ কাফেরকে আপনি পাঁচশ টাকা ধার দিয়েছিলেন?'

জবাবে বণিক বললেন, 'ওবের পর্বতের কাছে চওড়া একটা পাথরের ওপর।'

জাদিগ বললেন, 'আপনার খাতকের স্বভাবটা কীরকম?'

সেতক ফের বললেন, 'স্বভাবটা পাকা বদমাসের।'

আমি জানতে চাই, লোকটা চটপটে না স্থূলবুদ্ধি, সাবধানী না অবিবেচক।

সেতক বললেন, 'আমার ধারণা, ধার যারা শোধ দেয় না তাদের ভেতরে এ লোকটা সবচেয়ে চটপটে।'

জাদিগ জোর দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি তবে হাকিমের সামনে আপনার পক্ষ নিয়ে আমাকে ওকালতি করতে অনুমতি দিন।'

বস্তুত ইহুদিটিকে আদালতে সোপর্দ করে তিনি হাকিমকে বললেন, 'ন্যায়পরায়ণতার সিংহাসনের উপাদান, আমার প্রভুর হয়ে আমি ঐ ব্যক্তির কাছে পাঁচশ রৌপ্যমুদ্রা পুনরায় দাবি করছি, ঐ টাকাটা সে ফেরত দিতে চাইছে না।'

হাকিম বললেন, 'তোমাদের সাক্ষী-সাবুদ আছে?'

না তাঁরা সব মারা গেছেন; তবে যে চওড়া পাথরটির ওপর টাকা গোনা হয়েছিল, সেটি রয়েছে আর মহামান্য হাকিম-বাহাদুর যদি দয়া করে পাথরটিকে ডেকে আনতে আদেশ করেন, তাহলে আমার আশা, পাথরটি এসে সাক্ষী দেবে; আমি আর ইহুদি, পাথর এসে পৌঁছানো পর্যন্ত এখানে বসে থাকব; আমি আমার প্রভুর সেতকের খরচায় পাথরটিকে ডেকে আনতে পাঠাব।

'আমার কোনো আপত্তি নেই', জবাব দিয়ে হাকিম অন্যান্য মামলার ফয়সালা করতে লাগলেন।

বিচার শেষ করে তিনি জাদিগকে বললেন, তোমার পাথর তাহলে এখনও পর্যন্ত এলো না?'

ইহুদিটি হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'ধর্মাবতারটির যদি আগামীকাল পর্যন্ত এখানে বসে থাকেন তাহলেও পাথর এসে পৌছবে না। পাথরটি রয়েছে এখান থেকে ছয় মাইলেরও বেশি দূরে আর তাকে নাড়াতে পনেরো জন লোক লাগবে।

জাদিগ বলে উঠলেন, 'দেখুন তবে, আপনাকে আমি বলেছিলাম পাথর সাক্ষী দেবে; এ লোকটি যেহেতু জানে পাথর কোথায় আছে তখন সে কবুল করছে যে ঐ পাথরের ওপর টাকাটা গোনা হয়েছিল।'

বেকায়দায় পড়ে ইহুদিটি অবিলম্বে সবকিছু স্বীকার করতে বাধ্য হলো। হাকিম আদেশ দিলেন যে পাঁচশ মুদ্রা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত লোকটিকে ঐ পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হবে, কোনোরকম খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হবে না। টাকাটা তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল।

ক্রীতদাস জাদিগ আর পাথর আরব দেশে খুবই সমাদৃত হলো।

চিতা

মুগ্ধ সেতকের ক্রীতদাস তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। ব্যাবিলনের রাজার ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল ঠিক তেমনি সেতকেরও জাদিগকে ছাড়া চলত না; আর সেতকের স্ত্রী না থাকায় জাদিগ খুশি হয়েছিলেন। প্রভুর মধ্যে তিনি লক্ষ করেছিলেন ভালোর প্রতি একটা স্বাভাবিক টান, অকপট সারল্য আর বিবেচনা। আরব দেশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে সেতক দিব্য বাহিনীর অর্থাৎ, সূর্য, চাঁদ আর নক্ষত্রের উপসনা করতেন। এ ব্যাপারটায় জাদিগ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। খুবই সংযতভাবে এ বিষয়ে তিনি সেতকের সঙ্গে আলোচনা করতেন। অবশেষে তিনি সেতককে বললেন অন্য যে কোনো বস্তুর মতো ওগুলোও বস্তুপিণ্ডমাত্র, গাছ বা পাথরের চেয়ে ওগুলো বেশি পূজনীয় নয়।

সেতক বলতে লাগলেন, 'কিন্তু এসব চিরন্তন সত্তা থেকেই আমরা সব রকমের শুভ ফল লাভ করি; ওরাই প্রকৃতিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন, ওরাই ঋতু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাছাড়া ওরা আমাদের কাছ থেকে এত দূরে রয়েছেন যে ওদের ভক্তি না করে পারা যায় না।

জবাবে জাদিগ বললেন, 'লোহিত সাগরের পানি তো আপনাদের আরও বেশি কাজে লাগে; ঐ সাগর আপনাদের পণ্য ভারতবর্ষে পৌছে দেয়। লোহিতসাগর নক্ষত্রদের চেয়ে প্রাচীন হতে পারবে না কেন? যা অনেক দূরে রয়েছে তাকেই যদি ভক্তি করেন তাহলে পৃথিবীর শেষ সীমায় অবস্থিত গঙ্গাহ্রদিদের দেশটাকেও আপনাদের ভক্তি করতে হয়।'

সেতক বললেন, 'না, নক্ষত্ররা এমন দীপ্তিময় যে তাদের ভক্তি না করে আমি পারি না!'

সন্ধ্যার পর যে তাঁবুতে জাদিগ সেতকের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবেন তার মধ্যে তিনি অনেকগুলো বাতি জ্বালিয়ে রাখলেন, আর যেই তার প্রভু উপস্থিত হলেন অমনি জ্বলন্ত মোমবাতিগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বললেন, 'চিরন্তন আর উজ্জ্বল আলো, চিরকাল আমার ওপর সদয় থেক।'

কথাগুলো উচ্চারণ করে তিনি সেতকের দিকে না তাকিয়ে খেতে বসে গেলেন।

সেতক অবাক হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি করছটা কী?'

জাদিগ জবাব দিলেন, 'আপনি যা করেন তাই করছি; আমি ঐ মোমবাতির আরাধনা করছি; আর ওদের এবং আমার প্রভুকে অবহেলা করছি।'

এই নীতিবাক্যের নিহিতার্থ সেতক উপলব্ধি করতে পারলেন। ক্রীতদাসের জ্ঞান তার অন্তরে সংক্রমিত হলো, সৃষ্ট বস্তুর জন্য প্রচুর ধূপধুনো খরচ না করে তিনি সৃষ্টিকর্তা অনাদি সত্তার প্রতি ভক্তিমান হলেন।

সে সময়ে আরব দেশে বীভৎস এক আচার প্রচলিত ছিল। আদিতে এ আচার এসেছিল সিথিয়া থেকে, আর তারপর ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আতঙ্কজনকভাবে সমস্ত প্রাচ্যভূমি অধিকার করার উপক্রম করেছিল। বিবাহিত কোনো পুরুষ মারা গেলে তার প্রিয়তমা পত্নী যদি সতীসাধ্বী হতে চাইতেন তাহলে তিনি সবার সামনে তার স্বামীর শবদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতেন। পবিত্র এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো বৈধব্যের চিতা। যে উপজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্ত্রীলোক পুড়ে মরত সে উপজাতি সবচেয়ে বেশি মর্যদা পেত। সেতকের জ্ঞাতীগোষ্ঠীর একজন আরবে মারা গিয়েছিল, আলমোনা নামে তার নিতান্ত ভক্তিমতী বিধবা স্ত্রী কোনোদিন কোন সময়ে ঢাকঢোল আর সানাই বাজিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে তা

জানিয়ে দিল। বীভৎস এই আচার মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে কতটা বিরোধী জাদিগ তা সেতককে বুঝিয়ে দিলেন। প্রতিদিন যে তরুণী বিধবাদের পুড়ে মরতে দেওয়া হচ্ছে তারা দেশকে সন্তান দিতে পারত, না হলে নিদেনপক্ষে নিজের সন্তানদের মানুষ করতে পারত; আর জাদিগ তাকে মানতে বাধ্য করালেন যে সম্ভব হলে এমন বর্বর প্রথার বিলোপ ঘটানো উচিত।

সেতক জবাব দিলেন, 'হাজার বছরেরও আগে থেকে স্ত্রীলোকেরা পুড়ে মরার নিয়ম মেনে আসছে। কালের বিচার এই বিধানকে পবিত্র করে তুলেছে, আমাদের মধ্যে কে একে পালটাতে সাহস করবে? প্রাচীন অনাচারের চেয়ে মান্য আর কী আছে?'

জাদিগ আবার বললেন, 'যুক্তি তার চেয়েও প্রাচীন। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মাতব্বরদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন, আর আমি তরুণী বিধবার খোঁজ করছি।'

জাদিগ বিধবার সঙ্গে আলাপ করলেন; আর তার রূপের প্রশংসা করে মহিলার হৃদয়ে প্রবেশ করার পথ করে নিলেন, বললেন এরকম রূপ আগুনে বিসর্জন দেওয়া দারুণ দুঃখের ব্যাপার, এরপর তিনি মহিলার নিষ্ঠা আর সাহসের প্রশংসা করলেন।

তিনি মহিলাকে বললেন, 'স্বামীকে তাহলে আপনি দারুণ ভালোবাসতেন?'

আরব মহিলাটি জবাব দিল, 'ভালোবাসতাম? বিন্দুমাত্র না। লোকটা ছিল বর্বর। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, একেবারে অসহ্য; তবে তার চিতায় ঝাঁপ দেব বলে আমি স্থির করে ফেলেছি, এর আর কোনো নড়চড় নেই।'

জাদিগ বললেন, 'বলতে হয়, জ্যান্ত পুড়ে মরার মধ্যে চমৎকার একটা সুখ আছে?'

মহিলা বলল, 'ভাবলেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেমন থরথর করে কেঁপে ওঠে, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই; আমি সতীসাধ্বী; পুড়ে না মরলে সবাই আমায় নিয়ে হাসাহাসি করবে। আর আমার সমস্ত সুনাম লোপ যাবে।'

জাদিগের চেষ্টায় মহিলা শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল যে, লোকে কী বলবে ভেবে আর অহমিকার বশে সে পুড়ে মরতে চলেছে; এরপর জাদিগ মহিলার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন; তার কথার ভাবভঙ্গিতে মহিলা জীবনটাকে একটু ভালোবেসে ফেলল। এমনকি যে লোকটি তার সঙ্গে কথা বলছেন তার প্রতিও মহিলার কিছুটা সহৃদয়তা জাগিয়ে তুলতে জাদিগ সমর্থ হলেন।

জাদিগ তাকে বললেন, 'পুড়ে মরার বড়াই যদি আপনার পুরো কেটে যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি কী করবেন?'

মহিলা বলল, 'হায়রে, মনে হচ্ছে আপনাকে অনুরোধ করব আমাকে আপনি বিয়ে করুন।'

আন্তার্তের চিন্তায় জাদিগ আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, ফলে প্রসঙ্গটা তিনি এড়িয়ে যেতে বাধ্য হলেন, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি বিভিন্ন উপজাতির মাতব্বরদের খুঁজতে গেলেন। তিনি তাদের যা ঘটেছে সব বললেন আর এমন এক নিয়ম করতে বললেন যাতে পুরো একটি ঘণ্টা কোনো যুবকের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো বিধবাকে পুড়ে মরতে দেওয়া হবে না। এরপর থেকে আরব দেশে আর কোনো মহিলা পুড়ে মরেনি। বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত এমন এক নিষ্ঠুর আচারের একদিনে বিলোপ ঘটানোর জন্য লোকে জাদিগের কাছে ঋণী হয়ে রইল। ফলত জাদিগ আরব দেশের হিতকারী হয়ে রইলেন।

সান্ধ্যভোজ

জ্ঞানের আধার ঐ লোকটির সঙ্গ সেতক ত্যাগ করতে পারতেন না। তাই জাদিগকে তিনি বালজোরায় বিরাট মেলায় সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে মানুষের বাসযোগ্য সারা পৃথিবীর বড় বড় বণিকরা হাজির হতেন। নানার দেশের এত মানুষকে একসঙ্গে এক জায়গায় দেখে জাদিগ নিবিড় সান্ত্বনা পেলেন। তার মনে হলো বিশ্বসংসার বিরাট এব পরিবার, এই পরিবার বালজোরায় এসে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে একজন মিশরীয়, গঙ্গাহৃদির এক ভারতীয়, একজন কাতের অধিবাসী, একজন গ্রিক, একজন কেল্টিক এবং আরও বেশকিছু ভিন্‌দেশিদের সঙ্গে জাদিগ খেতে বসেছিলেন। আরব উপসাগরে বারবার যাতায়াতের ফলে নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে বলার মতো আরবি ভাষা তারা শিখেছিল।

মিশরের লোকটি খুবই চটে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল, 'কী জঘন্য জায়গা এই বালজোরা। জগতের সবচেয়ে দামি সম্পদ জমা রেখে হাজারটি মোহর আমায় কেউ দিতে চাইল না।'

সেতক বললেন, 'ব্যাপারটি কি? কোনো সম্পত্তি জমা রেখে লোকে টাকা দিতে চাইল না।'

মিশীরয়টি উত্তর দিল, 'আমার পিসিমার মৃতদেহ। পিসিমা ছিলেন মিশরের সেরা সতীসাধ্বী। চিরকাল তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন, এখানে আসার পথে তিনি মারা গেলেন, তাকে দিয়ে আমি একটি মোমি তৈরি করেছি, সেটি আমাদের সবচেয়ে সুন্দর মমির একটি; আর আমাদের দেশে এই মমিটা বন্ধক রেখে আমি যা চাইতাম তাই পেতে পারতাম। এমন একটি টেকসই সম্পত্তি জমা রেখে মাত্র হাজারটা মোহর কেউ দিতে চাইবে না এটা খুব তাজ্জব ব্যাপার।'

তিতিবিরক্ত হয়ে মিশরীয়টি সেদ্ধ করা অতি উপাদেয় একটা মুরগি মুখে পুরতে যাবে অমনি ভারতীয়টি তার হাত ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'আহা! করছেনটা কী?'

মমিওয়ালা লোকটি বলল, 'মুরগিটা খাচ্ছি।'

গঙ্গাহৃদির লোকটি বলল, 'এমন কাজ ভুলেও করবেন না, এমন হতে পারে পরলোকগত স্ত্রীলোকটির আত্মাও মুরগির শরীরে ভর করেছে, আর নিজের পিসিমাকে খাওয়ার মতো কাণ্ড ঘটাতে আপনার প্রবৃত্তি হবে না, মুরগি রান্না করাটা স্পষ্টভাবে সৃষ্টির অবমাননা।'

বদরাগী মিশরীয়টি বলল, 'আপনার ঐ সৃষ্টি আর মুরগির মানেটা কী? আমরা তো ষাঁড়ের পুজা করি আর তার মাংসও বেশ খাই।'

গাঙ্গেয় লোকটি বলল, ষাঁড়ের পূজা করেন? এও কি সম্ভব?'

অন্য জন জবাব দিল, 'এর চেয়ে বেশি সম্ভব আর কিছুই হয় না। এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর ধরে আমরা এই আচার মেনে আসছি আর আমাদের মধ্যে কেউ কখনো এ নিয়ে কিছু বলার আছে বলে ভাবতে পারিনি।'

ভারতীয়টি বলল, 'বলেন কী! এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর, হিসাবটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে; ভারতবর্ষে মানুষের বাস মাত্র আশি হাজার বছর ধরে, আর আমরা অবশ্যই আপনাদের চেয়ে প্রাচীন; তাছাড়া ঐ ষাঁড়গুলোকে বেদির ওপর কি শিকে বসানোর বুদ্ধি আপনাদের মাথায় আসার আগে থেকেই ব্রহ্মা আমাদের ষাঁড়ের মাংস খেতে বারণ করে দিয়েছেন।'

মিশরীয়টি বলল, 'অফিসের তুলনায় আপনাদের তুলনায় আপনাদের ঐ ব্রহ্মা একটা বেড়ে জীব। কী এমন চমৎকার বস্তু ব্রহ্মা গড়েছেন?'

জবাবে ব্রাহ্মণ বলল, 'তিনিই তো মানুষকে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছেন আর গোটা বিশ্ব তারই কাছে দাবা খেলার জন্য ঋণী।'

তার পাশে ছিল এক ক্যাল্ডীয়। সে বলল, 'আপনারা ভুল করছেন। এসব সৎকাজের জন্য লোকে মীন ওয়ান্নেস-এর কাছেই ঋণী, একমাত্র তাকেই ভক্তি করা উচিত। যে কেউ আপনাদের বলে দেবে তিনি ছিলেন স্বর্গীয় এক সত্তা, তার লেজটা ছিল সোনালি, সুন্দর তার মাথাটা ছিল মানুষের, আর প্রতিদিন তিন ঘণ্টা ধরে উপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি পানি থেকে উঠে আসতেন। তার গুটিকয় ছেলে ছিল, তারা সব ছিলেন রাজা, এত সবাই জানে। আমার বাড়িতে তার ছবি রয়েছে। আমি তাকে উচিত মতো পূজা করি। ষাঁড়ের মাংস যত খুশি তত খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাছ রান্না করাটা নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর অনাচার। তাছাড়া আমার কথার প্রতিবাদে কিছু বলার জন্য আপনাদের দুজনেরই বংশের বনেদিয়ানা আর বয়স খুবই কম। মিশরীয় জাতি যেখানে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বছরের হিসাব রাখে আর ভারতীয়রা আশি হাজার বছর নিয়ে বড়াই করে সেখানে আমাদের রয়েছে চার হাজার শতাব্দীর পঞ্জিকা। আমার কথা শুনুন, আপনাদের আবোল-তাবোল চিন্তা ছাড়েন, আর আপনাদের প্রত্যেককে আমি একটি করে ওয়ান্নেস-এর ছবি দেব।'

আলোচনায় যোগ দিয়ে কবালু-র লোকটি বলল, 'মিশরীয়দের, ক্যাল্ডীয়দের, গ্রিকদের, কেল্টিকদের, ব্রহ্মাকে, ষণ্ড অফিসকে সুন্দর মীন ওয়ান্নেসকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। তবে লোকে যাকে লি বা তিয়েন-এর যে কোনো একটা নামে ডাকতে পারে তিনিই সম্ভবত বহু ষাঁড় আর বহু মাছের সমান। নিজের দেশ সম্পর্কে কিছুই আমি বলব না, মিশর, ক্যাল্ডীয়া আর ভারতবর্ষ মিলিয়ে যত বড় সেই দেশ তার সমান। প্রাচীনত্ব নিয়ে আমি ঝগড়া করছি না কারণ সুখী হওয়াটাই আসল কথা আর পুরনো হওয়াটা অতি নগণ্য ব্যাপার; তবে পঞ্জিকার কথা বললে আমি বলব, সারা এশিয়া মহাদেশে আমাদের পঞ্জিকা গ্রহণ করছে, আর ক্যাল্ডিয়াতে গণিত শেখার আগে থেকেই আমাদের দেশে চমৎকার সব পঞ্জিকা ছিল।'

গ্রিকটি বলে উঠল, 'আপনারা সব মহামূর্ত, এছাড়া আর কিছুই নন। আপনারা কি জানেন না যে বিশৃঙ্খল ভূতসংস্কৃতিই সবকিছুর জন্মদাতা এবং আকার আর পদার্থই বিশ্বকে বর্তমান পরিণতি দান করেছে।

গ্রিকটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলে গেল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেল্টিকটি তাকে থামিয়ে দিল। তর্কাতর্কি যখন চলছিল সে তখন অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছিল।

ফলে তার মনে হলো, সে অন্য সবার চাইতে অধিক বিজ্ঞ। আর দিব্যি কেটে সে বলল যে, ত্যোতাৎ বা ওক গাছের পরগাছা ছাড়া আর কোনো কিছু সম্পর্কে কথা বলার মানে হয় না, সে নিজে কিছুটা পরগাছা সারাক্ষণ ট্যাকে গুঁজে রাখে; পৃথিবীতে মানুষের মতো মানুষ যদি কেউ কখনো থেকে থাকে সে ছিল একমাত্র তার পূর্বপুরুষ সিথিয়ানরা; সত্যি বলতে কি মাঝেমধ্যে তারা নরমাংস খেয়েছে, তবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তার জাতির প্রতি সমস্ত লোকের একান্ত শ্রদ্ধা থাকা উচিত। সবশেষে সে বলল, যদি কেউ ত্যোতাৎ সম্পর্কে কোনো বাজে কথা বলে তাহলে সে তাকে জীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে দেবে।

এর পর ঝগড়াটা বেশ তেতে উঠল, আর সেতক কল্পনার দৃষ্টিতে সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করলেন যখন খাওয়ার জায়গাটা রক্তে ভেসে যাবে।

তর্কাতর্কির সময় জাদিগ সারাক্ষণ চুপ করে ছিলেন, অবশেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; প্রথমেই সবচেয়ে ক্ষিপ্ত বলে কেল্টিকটিকে লক্ষ করে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি তাকে বলতেন যে তার কথাই ঠিক আর তার কাছে কিছুটা পরগাছা চাইলেন; তিনি সুন্দরভাবে বলার ক্ষমতার জন্য গ্রিকটির প্রশংসা করলেন আর সবগুলো তেতে ওঠা মনকেই শান্ত করলেন। কাতের লোকটিকে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন, কেননা সে ছিল সবার চাইতে যুক্তিনিষ্ঠ।

তারপর তিনি তাদের বললেন, 'বন্ধুগণ আপনারা অকারণে বিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কারণ আপানাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।'

এ কথায় তারা প্রত্যেকেই তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

জাদিগ কেল্টিকটিকে বললেন, 'আপনার ঐ পরগাছা আর উপসনা করেন না, উপাসনা করেন যিনি পরগাছা আর ওকগাছ সৃষ্টি করেছেন তার, বলুন এ কথা ঠিক কি না?'

কেল্টিকটি বলল, 'খাঁটি কথা।'

'আর মিশরীয় ভদ্রমহোদয়, 'আপনারা বিশেষ একটি ষাঁড়কে ভক্তি করছেন বলে বাইরে থেকে মনে হয়, তার মধ্য দিয়ে যিনি আপনাদের ষাঁড় দিয়েছেন তাঁকেই কি আপনারা ভক্তি জানান না?'

মিশরীয়টি বলল, 'হ্যাঁ'।

জাদিগ বলতে লাগলেন, 'সমুদ্র আর মাছ যিনি গড়েছেন মীন ওয়ান্নেস তারই অধীন।'

ক্যাল্ডীয়টি বলল, 'অবশ্যই।'

তিনি আরও বললেন, 'ভারতীয় আর কাতের লোকটিও আপনাদের মতো এক আদি সত্তাকে স্বীকার করেন; গ্রিক ভদ্রলোক যেসব অপূর্ব কথা বললেন আমি তো খুব ভালো করে বুঝিনি তবে আমার স্থির বিশ্বাস তিনিও একজন পরমাত্মাকে মানেন আকার আর পদার্থ যার অধীন।'

যে গ্রিকটিকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছিল সে বলল, জাদিগ তার ভাবনা চমৎকার ধরতে পেরেছেন।

জাদিগ উত্তর দিলেন, 'অতএব আপনাদের সকলের একই মত আর বিবাদের কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

সবাই জাদিগকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল। সেতক বেশ চড়া দামে তার পণ্য বিক্রি করে বন্ধু জাদিগকে নিয়ে তার নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ফিরে এলেন। সেখানে পৌঁছে জাদিগ শুনলেন যে তার অনুপস্থিতিতেই তার বিরুদ্ধে মামলার বিচার হয়ে গেছে এবং তাকে তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

অভিসার

জাদিগ যখন বালজোরায় ছিলেন সেই সময়ে নক্ষত্র উপাসক পুরোহিতরা তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অল্পবয়সি যেসব বিধবাকে তারা চিতায় পুড়ে মরতে পাঠাতেন, আইনত তাদের মণি-মুক্তা আর গয়নাগাটির মালিক হতেন পুরোহিতরা; জাদিগ তাদের যে সর্বনাশ করেছিলেন তার তুলনায় তাকে পুড়িয়ে মারাটা ছিল নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। সুতরাং দিব্য বাহিনী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার অভিযোগে তারা জাদিগকে অভিযুক্ত করলেন। তারা জাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আর হলপ করে বললেন যে তারা জাগিদকে বলতে শুনেছেন, নক্ষত্রেরা সমুদ্রে অস্ত যায় না। এই ভয়াবহ ধর্ম বিরোধী মন্তব্যে বিচারকরা শিউরে উঠলেন, এই অপবিত্র উক্তি তার নিজেদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলতে গেলেন, আর জাদিগের যদি পোশাক-আশাকের দাম দেওয়ার সম্বল থাকত তাহলে তাঁরা তাই করতেন। তবে বেদনার আতিশয্যে তারা জাদিগকে তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারার দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য মরীয়া সেতকের প্রভাবপ্রতিপত্তি কোনো কাজেই লাগল না, শীঘ্রই তিনি নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। তরুণী বিধবা আলমোনার

জীবনের ওপর খুবই মায়া জন্মেছিল, আর এর জন্য সে জাদিগের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। যে চিতায় পুড়িয়ে মরার কুৎসিত আচার সম্পর্কে জাদিগ তাকে অবহিত করেছিলেন সেই চিতা থেকে সে জাদিগকে উদ্ধার করবে বলে স্থির করল। নিজের মাথায় সে মতলব পাকাল, এ ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলল না। পরদিন জাদিগের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা, তাকে বাঁচানোর জন্য আলমোনার হাতে সময় ছিল কেবল রাতটা; পরোপকারী এবং বিচক্ষণ স্ত্রীলোক হিসেবে সে যে উপায়ে কাজটা হাসিল করল তার বিবরণ দেওয়া যাক।

সে সুগন্ধি মাখল; খুবই ঝলমলে আর মনভোলানো সাজে নিজের রূপকে বাড়িয়ে তুলল, আর নক্ষত্রপূজারী পুরোহিতদের প্রধানের সঙ্গে গোপনে কথা বলেতে চাইল।

ঐ শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধের সামনে গিয়ে সে তাকে বলল, 'বৃহৎ ভল্লুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বৃষের সহোদর, বৃহদ্‌কুক্কুরের খুল্লতাতপুত্র (এগুলো ছিল ঐ পুরোহিত-প্রধানের পদবি) আমি আপনার কাছে আমার বিবেকের দংশনের কথা নিবেদন করতে এসেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে প্রিয় স্বামীর চিতায় সহমরণে না গিয়ে আমি ঘোরতর পাপ করেছি। সত্যি বলতে গেলে, বাঁচিয়ে রাখার মতো কিইবা আমার ছিল? এক এই নশ্বর শরীর আর এরই মধ্যে তা একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে।'

কথা বলতে বলতে জামার দীর্ঘ রেশমি হাতা থেকে সুডোল আর ধপধপে ফরসা নগ্ন বাহু দুটি বের করে সে বলল, 'আপনিই বলুন কিইবা এর দাম!'

পুরোহিত প্রধান মনে মনে বুঝলেন, ওর দাম অনেক। তার চোখে সে কথা বলল, তার মুখ তাতে সায় দিল; তিনি দিব্যি কেটে স্বীকার করলেন যে জীবনে এমন সুন্দর বাহু আর কখনো তিনি দেখেননি।

বিধবা তাকে বলল, 'হায়! হাত দুটি হয়তো বা বাকি শরীরের তুলনায় কম খারাপ তবে নিজের বুক নিয়ে যে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানো উচিত নয় একথা আপনি মানবেনই।'

তারপর মন ভোলানো অতুলনীয় স্তন সে দেখাল। প্রকৃতি এমনটি আর কখনো সৃষ্টি করেনি। এর পাশাপাশি হাতির দাঁতের আপেলের ওপর গোলাপের কুঁড়িকে বুই কাঠের ওপর লালচে আভার মতো দেখাত, আর গামলার জল থেকে সদ্য চুবিয়ে তোলা ভেড়ার বাচ্চাকে কিছুটা বাদামি হলুদ বলে মনে হতো। ঐ বুক, কোমল দীপ্তিতে উজ্জ্বল মদালস তার বড় বড় চোখ, সামান্যতম কলঙ্কহীন দুধের মতো সাদায় মেশানো গোলাপি রঙের প্রাণময় তার গাল, তার ঐ নাক যা লেবানন পর্বতের মিনারের মতো নয়, আরব সাগরের সবচেয়ে সুন্দর মুক্তাকে আটকে রাখা প্রবালের দুটি আলোর মতো ওষ্ঠাধর, সমস্ত মিলে বৃদ্ধের মনে ধারণা হলো যে তার বয়স বিশ বছর। কোনোরকমে তোতলাতে তোতলাতে তিনি তখন তার প্রেম নিবেদন করলেন। আলমোনা দেখলেন তিনি প্রেমের আবেগে জ্ঞান হারিয়েছেন, তখন তার কাছে সে জাদিগকে ক্ষমা করতে অনুরোধ জানাল।

তিনি বললেন, 'হায় সুন্দরী, আমি যদি তোমার কাছে জাদিগকে ক্ষমা করার অনুমতি দিই, আমার সেই মার্জনা কোনো কাজে লাগবে না, ওতে আমার তিনজন সহকর্মীর সই থাকা দরকার।'

আলমোনা বলল, 'তবু আপনি সই করুন।'

পুরোহিত বললেন, 'নিশ্চয় করব, তবে শর্তটা হলো, আমার অনুকম্পার দাম হবে তোমার প্রসাদ।'

আলমোনা বলল, 'আমাকে আপনি একান্ত কৃতার্থ করছেন। সূর্যাস্তের পর শিট তারা আকাশে দেখা দিলেই দয়া করে আমার শোয়ার ঘরে চলে আসবেন। গোলাপি একটি পালঙ্কের উপর আপনি আমায় দেখতে পাবেন। তখন আপনার দাসীর সঙ্গে আপনি যা চান তাই করবেন।'

সই নিয়ে আলমোনা বেরিয়ে পড়ল আর রেখে গেল কামাসক্ত, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত সেই বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ গোসল করতে করতে সেই দিনটা কাটালেন। সিংহলী দারুচিনি আর তিদর ও তের্নাৎ দ্বীপের মূল্যবান মশলা দিয়ে তৈরি একটা সরবত খেয়ে তিনি অধীরভাবে শিট তারার উদয়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে সুন্দরী আলমোনা দ্বিতীয় পুরোহিত-প্রধানকে খুঁজতে গেল। তিনি আলমোনাকে বিশেষভাবে জানালেন যে সূর্য, চন্দ্র আর আকাশমণ্ডলের সবগুলো জ্যোতিঃপুঞ্জ তার রূপের কাছে আলেলায় আলো মাত্র। আলমোনা তার কাছে একই অনুগ্রহ চাইল আর তাকে একই মূল্য দিতে বলা হলো। সম্মতি জানিয়ে আলমোনা দ্বিতীয় পুরোহিত-প্রধানকে আলজেনিব তারার উদয়ের পর দেখা করার সময় দিল। সেখান থেকে সে তৃতীয় আর চতুর্থ পুরোহিতের বাড়ি গেল, প্রতিবারই সে একটি করে দস্তখত নিয়ে একেকটা তারার সময় নিয়ে এলো। তারপর গুরুতর কোনো

কাজে সে বিচারকদের তার বাড়িতে আসতে খবর দিল। তারা উপস্থিত হলে আলমোনা নাম চারটি তাদের দেখাল আর কী মূল্যে ঐ চার ব্যক্তি জাদিগের মুক্তি বিক্রি করেছেন তা বলল। পুরোহিতদের প্রত্যেকেই যথাসময়ে এসে হাজির হলেন; প্রত্যেকেই সহকর্মী আর বিশেষ করে বিচারকদের দেখে অবাক হলেন; সকলের সামনে তাদের লজ্জার কাহিনি প্রকাশিত হলো। জাদিগ নিস্তার পেলেন। সেতক আলমোনার চাতুর্যে এমন মুগ্ধ হলেন যে, তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

নৃত্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সেতকের সেরদিব দ্বীপে যাওয়ার দরকার ছিল; কিন্তু সকলেই জানে, বিয়ের পরের প্রথম মাসটি হলো মধুচন্দ্রিমা, সে মাসে স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়তে পারলেন না কিংবা স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে যেতে পারলেন বলে তার মনে হলো না : তাই তিনি বন্ধু জাদিগকে তার হয়ে ঘুরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন।

জাদিগ ভাবতে লাগলেন, 'হায়!' সুন্দরী আস্তাতে আর আমার মধ্যে দূরত্বটাকে কি আমাকে আরও বাড়িয়ে যেতে হবে? তবু যারা আমার উপকার করেছেন তাদের কাজ আমাকে করতেই হবে।'

ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সেরদিব দ্বীপে অসামান্য মানুষ হিসেবে পরিচিত না হয়ে তিনি খুব বেশিদিন কাটাতে পারলেন না। তার ওপর বণিকদের সবরকম বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ভার পড়তে লাগল, জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হলো, যে সামান্য কিছু লোক অন্যের পরামর্শ নেয় তিনি হয়ে উঠলেন তাদের পরামর্শদাতা। রাজা তার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করতে চাইলেন। অচিরেই তিনি জাদিগের গুণগ্রাহী হয়ে পড়লেন। জাদিগের বিচক্ষণতায় তার আস্থা জন্মাল এবং জাদিগকে তিনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন। রাজার সৌহার্দ এবং শ্রদ্ধা জাদিগকে আতঙ্কিত করে তুলল। মোয়াবদারের সহৃদয়তা তার জীবনে যে দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিল তা তার অন্তরকে দিবারাত্রি বিদ্ধ করছিল।

তিনি ভাবতে থাকলেন, 'আমাকে রাজার ভালো লাগছে, আমি কি তবে ডুবতে যাচ্ছি?'

অথচ মহামান্য রাজার সমাদর তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না; কেননা সান-ব্যসনার পুত্র তস্য পুত্র ন্যুসানাব, তস্য পুত্র সেরদিবের রাজা নাব্যুসান যে এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের একজন ছিলেন সেকথা না মেনে উপায় নেই তার সঙ্গে আলাপ করলে তাকে ভালো না লাগাটা কঠিন ছিল।

লোকে চিরকাল ঐ ভালোমানুষ রাজাকে প্রশস্তি, প্রতারণা আর প্রবঞ্চনা করে আসছিল : সে তার রাজকোষে লুটে নেবে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলত। সেরদিব দ্বীপের প্রধান শুল্কাধ্যক্ষ সব সময় এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন আর অন্যান্যা বিশ্বস্তভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করত: রাজা বারকয়েক কোষাধ্যক্ষ পালটেছেন কিন্তু চিরাচরিত প্রথাটাকে পালটাতে পারেননি। সেই প্রথা অনুযায়ী রাজস্বটা দুটো অসমান ভাগে ভাগ হয়ে যেত। মহামান্য রাজাবাহাদুল চিরকাল তার সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশটা পেতেন আর সিংহভাগটা যেত শাসনকর্তাদের অধিকারে।

রাজা নাব্যুসান প্রাজ্ঞে জাদিগকে তার দুঃখের কথা জানালেন। তিনি তাকে বললেন, 'এত সব অদ্ভুত জিনিস আপনি জানেন, এতটুকু চুরি করবে না এমন একজন কোষাধ্যক্ষ আমাকে খুঁজে বের করে দেওয়ার কোনো উপার কি আপনার জানা নেই?'

জাদিগ উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই আছে। হাত ময়লা করবে না এমন কোষাধ্যক্ষ আপনাকে খুঁজে দেওয়ার অব্যর্থ একটি উপায় আমি জানি।'

মুগ্ধ রাজা জাদিগকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন তার জন্য কী করতে হবে?

জাদিগ বললেন, 'কোষাধ্যক্ষের চাকরির জন্য যারা হাজির হবে তাদের সবাইকে কেবল নাচাতে হবে আর যে সবচেয়ে দ্রুত নাচতে পারবে সেই হবে সবচেয়ে খাঁটি লোক।'

রাজা বললেন, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। আমার অর্থ দপ্তরের অদ্যক্ষ বেছে নেওয়ার জন্য এ হবে এক মজার পদ্ধতি। আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সেই লোকটিই হবে সবচেয়ে দক্ষ আর সৎ ধনাধ্যক্ষ যে নাচতে গিয়ে সবচেয়ে ভালো লাফাতে পারবে।'

জাদিগ জানালেন, 'বলছি না যে সে সবচেয়ে দক্ষ হবে, তবে জেনে রাখুন সেই হবে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সৎ লোক।'

জাদিগ এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিলেন যে, রাজার মনে হলো ধনাধ্যক্ষ চিনে নেওয়ার কোনো অলৌকিক রহস্য তার জানা আছে।

জাদিগ বললেন 'অলৌকিক রহস্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী লোকজন আর এইসব বিষয়ে বই চিরকাল আমায় বিরক্ত করছে : যে পরীক্ষার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি, মহামান্য রাজা যদি তা আমায় করতে দেন তাহলে তার বিশ্বাস হবে যে, আমার রহস্যটা অতি সরল, অতি সাধারণ ব্যাপার।'

রহস্যটা অলৌকিক বলে উপস্থিত করলে সেরদিবের রাজা নাব্যুসান যতটা না অবাক হতেন ব্যাপারটা সরল শুনে তার চেয়ে বেশি অবাক হলেন।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো, আপনি যা ভালো বোঝেন করুন।'

জাদিগ বললেন, 'যা করার আমার হাতে ছেড়ে দিন। এই পরীক্ষায় আপনি কতটা লাভবান হবেন তা আপনি ধারণা করতে পারছেন না।'

সেদিনই তিনি রাজার নাম ঘোষণা জারি করে দিলেন যে, যারা ন্যুসানাবের পুত্র মহামান্য রাজাবাহাদুর নাব্যুসানের মহারাজ স্বাধ্যাক্ষের পদে প্রার্থী হতে চায় তাদের সবাইকে মকর মাসের শুক্ল প্রতিপদে হালকা রেশমি পোশাক পরে রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অপেক্ষা করার ঘরে হাজির হতে হবে। চৌষট্টিজন প্রার্থী হাজির হলো। পাশের একটি বৈঠকখানায় বেহালাবাদকদের ডেকে আনা হয়েছিল, নাচের সবরকম বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল; তবে ঐ বৈঠকখানার দরজা বন্দ ছিল আর ঐ ঘরে ঢোকার জন্য বেশ অন্ধকার সরু একটি দরদালান পার হয়ে আসতে হচ্ছিল। একজন দ্বারী এক এক করে প্রার্থীদের প্রত্যেককে ঐ পথ দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। পথে প্রত্যেককে কয়েক মুহূর্ত একা ছেড়ে দেওয়া হলো। মতলবটা জেনে রাজা তার সমস্ত ধনদৌলত ঐ দালানে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। প্রার্থীরা সবাই বৈঠকখানায় হাজির হওয়ার পর মহামান্য রাজা তাদের নাচতে আদেশ দিলেন। এমন জবরজংভাবে, এমন হতকুচ্ছিৎ ভঙ্গিতে কেউ কখনো নাচেনি; তাদের সবার মাথা ঝুলে পড়েছিল, কোমর বেঁকে গিয়েছিল, হাত দুটো দুপাশে সাঁটা ছিল!

ফিসফিস করে জাদিগ বললেন, 'বদমাশের দল!'

তাদের ভিতর কেবল একজন ক্ষিপ্রগতিতে পা ফেলছিল, তার মাথা উঁচু, দৃষ্টি অকম্পিত, হাত দুটো ছড়ানো, শরীরটা টানটান, হাঁটু স্থির।

জাদিগ বলতে লাগলেন, 'আহ! খাঁটি লোক! সাচ্চা লোক!'

রাজা ঐ গুণী নাচিয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাকে কোষাধ্যক্ষ বলে ঘোষণা করলেন; আর জগতের মহউত্তম ন্যায়বিচারের মাধ্যমে অন্যদের সকলের শাস্তি এবং অর্থদণ্ড হলে। কেননা প্রত্যেকে দরদালানে থাকার সময় নিজের নিজের পকেট বোঝাই করে নিয়েছিল, আর প্রায় হাঁটতেই পারছিল না। ঐ চৌষট্টিজন নাচিয়ের তেষট্টিজন প্রবঞ্চক দেখে মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে রাজার বিতৃষ্ণা জন্মাল। অন্ধকার দরদালানটি 'প্রলোভনের অলিন্দ' নামে অভিহিত হলো। পারস্য দেশ হলে ঐ তেষট্টিজন সম্ভ্রান্ত লোককে শূলে চড়ানো হতো। অন্য কোনো দেশে একটি বিচার পরিষদ গঠন করা হতো, ঐ পরিষদ খরচা বাবদ চুরি করা টাকার তিনগুণ হজম করে নিত আর রাজকোষে কানাকড়িও জমা দিত না, অন্য একটি রাজ্যে, এরা নিজেদের কাজকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করে দিত আর একান্ত লঘুগামী ঐ নাচিয়েকে অপমানিত করাত; সেরদিবে এরা শুধু রাজ্যের সম্পদ-বৃদ্ধির শাস্তি পেল, কারণ নাব্যুসান ছিলেন খুবই দয়ালু।

রাজা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন; জাদিগকে তিনি যে পরিমাণ অর্থ দিলেন ততটা অর্থ কোনো কোষাধ্যক্ষ কখনো তার মনিব রাজার কাছ থেকে হরণ করেনি। জাদিগ ব্যাবিলনে বার্তাবহ পাঠানোর জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করলেন। বার্তাবহের ওপর আস্তার্তের অদৃষ্টে কী ঘটেছে তা জাদিগকে জানানোর ভার দেওয়া হলো। এই আদেশ দেওয়ার সময় তার গলা কেঁপে উঠল, রক্তের প্রবাহ বিপরীত গতিতে হৃদপিণ্ডের দিকে ছুটতে লাগল, দৃষ্টি অন্ধকারে ঢেকে গেল, প্রাণ যে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। সংবাদবাহক রওনা হয়ে গেল, জাদিগ তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলেন। রাজবাড়িতে ফিরে এসে কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না, নিজের ঘরে রয়েছেন ভেবে ভালোবাসা শব্দটি উচ্চারণ করলেন।

রাজা বলে উঠলেন, 'হায়! ভালোবাসা, ওটাই হলো আসল কথা; আমার কষ্টের কারণটা আপনি ধরে ফেলেছেন। সত্যি আপনি মহান। আপনি আমায় একজন নির্লোভ কোষাধ্যক্ষ খুঁজে দিয়েছেন; আমার আশা, ঠিক তেমনি কী উপায়ে যথার্থ বিশ্বস্ত একটি নারীকে চিনে নেওয়া যায় তা আমায় শিখিয়ে দেবেন।'

জাদিগ সম্বিত ফিরে পেলেন। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারের মতো প্রেমের ব্যাপারেও রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন। তবে এ ব্যাপারটা তার কাছে আরও

কঠিন বলে মনে হলো।

নীল চোখ

রাজা জাদিগকে বললেন, 'দেহ আর হৃদয়...'

এ কথায় ব্যাবিলনবাসী জাদিগ মহামান্য রাজার কথায় বাধা না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'আপনি 'হৃদয় আর চেতনা' বললেন না শুনে আমি আপনার ওপর কী যে খুশি হয়েছি! কারণ ব্যাবিলনে আলাপ-আলোচনার মধ্যে এ কথাগুলো ছাড়া অন্য কথা শোনা যায় না, হৃদয় আর চেতনার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বই দেখা যায় না, ঐ বইগুলো যারা লিখেছেন তাদের ঐ দুটির কোনোটিই নেই, যাই হোক, মহারাজ যেকথা বলছিলেন দয়া করে তা বলে যান।'

নাব্যুসান বলে যেতে লাগলেন, 'আমার দেহ আর হৃদয় ভালোবাসারই জন্য। এই দুই শক্তির প্রথমটির একান্ত দরকার তৃপ্ত হওয়া। আমার সেবার জন্য এখানে একশো স্ত্রী রয়েছে। তারা খুবই সুন্দরী, খুশি করতে আগ্রহী, কামনা জাগানোর মতো, এমনকি ইন্দ্রিয়ের সুখ চায় কিংবা আমার কাছে সেরকম ভাব দেখায়। আমার হৃদয় খুব একটা সুখী হতে পারে না। আমার শুধু ভীষণভাবে মনে হতে থাকে যত সোহাগ সেরদিবের রাজার জন্য আর নাব্যসানকে নিয়ে তেমন মাথাব্যথা কারও নেই। আমার স্ত্রীদের যে আমি অসতী বলে ভাবি তা নয় : কিন্তু আমি এমন একটি হৃদয় খুঁজে পেতে চাই যা হবে একান্তভাবে আমার। এমন সম্পদের বিনিময়ে যাদের রূপলাবণ্য আমার অধিকারে সেই একশো সুন্দরীকে আমি দিয়ে দিতে পারি : দেখুন, এই একশো বেগমের ভিতর থেকে আপনি যদি আমায় তেমন একজনকে বের করে দিতে পারেন যার ভালোবাসা সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

ধনাধ্যক্ষদের ব্যাপারে জাদিগ যা করেছিলেন এবারও সেভাবে জবাব দিলেন, 'মহারাজ, যা করার আমার হাতে ছেড়ে দিন, তবে প্রথমেই অনুমতি দেন যে আপনি প্রলোভনের অলিন্দনে যা ছড়িয়ে রেখেছিলেন আমি যেন তা ব্যবহার করতে পারি। আপনাকে তার পুরো হিসাব আমি দেব আর তার কিছুই আপনি খোয়াবেন না।'

রাজা তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন।

জাদিগ সেরঁদিব থেকে যথাসম্ভব কদাকার বেঁটেখাটো তেত্রিশজন সবচেয়ে সুন্দর দেখতে তেত্রিশজন ছোকরা চাকর, সবচেয়ে বাক্যবাগীশ স্বাস্থ্যবান ত্রেত্রিশজন ভিক্ষুককে বেছে নিলেন। এদের সবাইকে তিনি বেগমের খাসকামরায় ঢোকার অনুমতি দিলেন; প্রতিটি বেঁটে কুঁজোর কাছে চার হাজার করে সোনার মোহর রাখা হলো, এই অর্থ তার ইচ্ছেমতো দান করতে পারবে। আর প্রথম দিনই কুঁজোদের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। ছোকরা চাকরদের এক নিজেকে ছাড়া দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তারা দুই বা তিন দিনের মাথায় সাফল্য অর্জন করল। ভিক্ষুকদের একটু বেশি সাধ্যসাধনা করতে হলো, তবে শেষ পর্যন্ত তেত্রিশ জন ভক্তিমতী তাদের কাছে আত্মনিবেদন করল। প্রত্যেকটি কামরার মধ্যে লক্ষ করা যায় এমনকিছু ফোকর ছিল; সেই ফোকর দিয়ে সমস্ত দেখেশুনে রাজা হতভম্ব হলেন, তার একশো পত্নীর মধ্যে নিরানব্বই জন তারই চোখের সামনে আত্মনিবেদন করল। বাকি রইল শুধু একজন। তার বয়স খুবই কাঁচা, একেবারেই সে নতুন, মহামান্য রাজা তার কাছে কখনো যাননি। এক এক করে তিনজন কুঁজোকে তার কাছে পাঠানো হলো, ওরা তাকে বিশ হাজার মোহর পর্যন্ত দিতে চাইল; তবুও তার কোনো মতিভ্রম হলো না, টাকা তাদের চেহারার জৌলুস বাড়িয়ে দেবে, কু'জোদের এরকম ধারণায় সে না হেসে থাকতে পারল না। পরে সবচেয়ে ভালো দেখতে দুজন ছোকরা চাকরকে তার সামনে হাজির করা হলো, সে জানিয়ে দিল রাজাকে তার আরও সুন্দর বলে মনে হয়। সবচেয়ে বাকপটু ভিক্ষুককেও তার কাছে যেতে দেওয়া হলো আর তারপর সবচেয়ে দুঃসাহসী যে তাকে। প্রথম জনকে তার বাচাল বলে মনে হলো আর দ্বিতীয় জনের কোনোরকম যোগ্যতা থাকতে পারে বলে তার ভুলেও মনে হলো না।

সে বলতে লাগল, 'হৃদয়টাই সব, কুঁজোর সোনাদানা, যুবকের রূপ কি ভিক্ষুকের মন ভোলানোর চেষ্টা-এর কোনোটাতেই আমি ভুলব না। একমাত্র ন্যুসানাবের পুত্র নাব্যুসানকেই আমি ভালোবাসব আর তিনি আমায় নিজ থেকে ভালোবাসবেন। তার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব।

আনন্দ, বিস্ময় আর আবেগে রাজা আত্মহারা হয়ে উঠলেন। যে অর্থ কুঁজোদের সাফল্য এনে দিয়েছিল তার সমস্তটা আদায় করে তিনি, ফালিদকে দিলেন। ফালিদ ছিল ঐ তরুণীর নাম। তাকে তিনি দিলেন নিজের হৃদয় : মেয়েটি সত্যি তার যোগ্য ছিল। যৌবনের ফুল আর কখনো এমন উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি, সৌন্দর্যের মায়া আর কখনো এমন মোহময় হয়ে ওঠেনি। কাহিনির সত্যনিষ্ঠার জন্য বলতে হয় মেয়েটি

শ্রদ্ধা জানানোয় ঠিক পারদর্শী ছিল না, তবে সে পরির মতো নাচতে জানত, মৎস্যনারীর মতো গান গাইতে পারত আর কথা বলত বাগদেবীর মতো : তার গুণ আর প্রতিভার কোনো অভাব ছিল না।

ভালোবাসা পেয়ে নাব্যুসান তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসলেন, কিন্তু ফালিদের চোখ ছিল নীল আর সেটাই বিরাট এব অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াল। গ্রিকরা যাদের গোনেত্রা বলত তাদের প্রতি রাজার আসক্ত হওয়া প্রাচীন এক বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল। পাঁচ হাজার বছরেরও আগে মহাভিক্ষু এই বিধান জারি করে গিয়েছিলেন। সেরদিব দ্বীপের আদি রাজার প্রণয়ীকে নিজের কবলে আনার জন্য ঐ আদি ভিক্ষু দেশের মূল শাসনতন্ত্রের নীল চোখের এই অভিশাপকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ এসে রাজার কাছে আপত্তি জানিয়ে গেল। লোকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগল যে রাজ্যের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে, পাপের ভার পূর্ণ হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় সমস্ত জগৎসংসার রসাতলে যেতে চলেছে; মোট কথা ন্যুসানাবের পুত্র নাব্যুসান ডাগর দুটি নীল চোখের প্রেমে মজেছেন। কুঁজোরা, ধানাধ্যক্ষরা, ভিক্ষুরা কালোচোখ কালোচুলওয়ালা নারীরা প্রতিবাদে সারা রাজ্য মুখর করে তুলল।

সেরদিব-এর উত্তরে কিছু বর্বর জাতির বাস ছিল, তার তখন দেশব্যাপী এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে সদাশয় নাব্যুসানের রাজ্যে অতর্কিতে হানা দিল। রাজা-প্রজাদের কাছে অতর্কিতে হানা দিল। রাজা-প্রজাদের কাছে অর্থসাহার্য চাইলেন; রাজ্যের অর্ধেক রাজস্বের মালিক ছিলেন ভিক্ষুরা, তারা শুধু আকাশের দিকে হাত তুলেই ক্ষান্ত হলেন, আর রাজাকে সাহায্য করার জন্য ঐ হাত সিন্ধুকে ঢোকাতে রাজি হলেন না। গানবাজনা সহ মনমাতানো কিছু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে তারা দেশটাকে বর্বরদের কবলে ছেড়ে দিলেন।

আর্তকণ্ঠে নাব্যুসান বললেন, 'প্রিয় জাদিগ, এই ভয়ানক সংকট থেকে তুমি কি আমায় আরেকবার উদ্ধার করতে পারবে?'

জাদিগ জবাব দিলেন, 'স্বচ্ছন্দে পারি, ভিক্ষুদের টাকাকড়ি যত চান পেতে পারেন, ওদের কোঠাবাড়িগুলে যেখানে রয়েছে ঐ অঞ্চলটা অরক্ষিত রেখে আপনার নিজের অধীন জায়গাগুলো রক্ষা করুন।'

নাব্যুসান এই পরামর্শের অন্যথা করলেন না। ভিক্ষুরা রাজার পায়ে পড়ে তার সাহায্য ভিক্ষা করতে এলেন। রাজা মনভোলানে সংগীতে তার জবাব দিলেন, ঐ সংগীতের বাণীতে দেবতাদের কাছে ভিক্ষুদের জমিজমা রক্ষা করার প্রার্থনা জানানো হলো। শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুরা অর্থ দিলেন এবং রাজা সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ সাঙ্গ করলেন। এভাবে জাদিগ তার বিচক্ষণ এবং সৎ পরামর্শ দিয়ে আর সবচেয়ে বড় উপকার করে রাজ্যের একান্ত প্রতিপ্রত্তিশালী লোকদের নিদারুণ শত্রুতাকে ডেকে আনলেন। ভিক্ষু আর কালোচোখে কালোচুল নারীরা তার সর্বনাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। ধনাধ্যক্ষ আর কুঁজোরা তাকে ছেড়ে দিল না; লোকে সদাশয় নাব্যুসানের কাছে জাদিগকে সন্দেহজনক চরিত্রে পরিণত করল। জরাথ্রুস্টের বাণী অনুসারে, উপকার প্রায়শ বাইরের বৈঠকখানায় পড়ে থাকে, সন্দেহ মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকে পড়ে ; প্রতিদিন নতুন নতুন অভিযোগ আসতে থাকে, প্রথমটি উড়িয়ে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টি স্পর্শ করে তৃতীয়টি আহত করে, চতুর্থটি মৃত্যু ঘটায়।

জাদিগ শঙ্কিত হলেন। বন্ধু সেতকের ব্যবসার কাজ তিনি ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন আর সেতকের টাকাকড়ি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবার ঐ দ্বীপ ছেড়ে রওনা হওয়া কোনো গত্যন্তর তিনি দেখতে পেলেন না এবং তিনি নিজেই আস্তার্তের খবর নিতে যাবেন বলে স্থির করলেন।

তিনি যখন ভাবতে লাগলেন, 'কেননা, সেরদিবে থাকলে ভিক্ষুরা আমায় শূলে চড়াবে; কিন্তু যাবটা কোথায়? মিশরে গেলে আমায় ক্রীতদাস হতে হবে, আবার বোঝা যাচ্ছে আরবদেশে গেলে আমাকে পুড়িয়ে মারা হবে। তবু আমাকে জানতে হবে আস্তার্তের কী গতি হলো : বেরিয়ে তো পড়া যাক আর দেখা যাক দুর্ভাগ্য আমার জন্য আর কী জমা করে রেখেছে?'

দস্যু

পার্বত্য আরব দেশ ও সিরিয়ার মাঝামাঝি সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছে জাদিগ সুরক্ষিত এক দুর্গপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এই দুর্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কিছু আরব বেরিয়ে এলো। জাদিগ দেখলেন, তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে; ওরা চিৎকার করে তাকে বলতে লাগল, 'তোমাদের সঙ্গে যা আছে সব আমাদের, আর তোমরা আমাদের প্রভুর।'

প্রত্যুত্তরে জাদিগ তরবারি বের করলেন, তার সাহসী চাকরও প্রভুকে অনুসরণ করল। প্রথমে যে আরবরা তাদের ধরতে এলো তারা ওদের ধরাশায়ী করলেন।

আরবদের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেল; এতটুকু বিচলিত হয়ে জাদিগ আর তার চাকর যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে স্থির করলেন। দেখা গেল দুটি মানুষ বিপুল এক জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে; এরকম সংগ্রাম বেশিক্ষণ চলতে পারে না। ঐ দুর্গের অধিপতির নাম ছিল আর্বোগাদ। জাদগ যে কী অসীম বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছেলেন জানালা থেকে তা দেখে তার প্রতি আর্বোগাদের শ্রদ্ধা জন্মাল। দ্রুত নেমে এসে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের হটিয়ে দিয়ে তিনি ঐই দুই পর্যটককে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, 'আমার জমিদারির ভিতর দিয়ে যা কিছু যায় তা আমার, আর অন্য কারও জমিদারিতে যা আমার চোখে পড়ে তাও আমার, তবে আপনাকে আমার এমন খাঁটি লোক বলে মনে হচ্ছে যে ঐ সাধারণ নিয়ম থেকে আমি আপনাকে রেহাই দিচ্ছি।'

জাদিগকে তিনি তার দুর্গপ্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন, নিজের লোকজনকে জাদিগের যত্নআত্তি করতে আদেশ দিলেন; আর রাতেবেলায় আর্বোগাদ জাদিগের সঙ্গে আহার করতে চাইলেন।

যে আরবদের লোকেরা 'লুটেরা' বলে ঐ দুর্গাধিশ ছিলেন তাদেরই একজন; কিন্তু বহুবিদ দুষ্কর্মের মধ্যে কখনো-সখনো তিনি কিছু ভালো কাজ করতে; ভয়ঙ্কর লালসা নিয়ে তিনি লুট করতেন আর দান করতেন দরাজ হাতে, তিনি ছিলেন কর্মক্ষেত্রে দুর্জয় সাহসী, আলাপ-ব্যবহারে যথেষ্ট ভদ্র, খাওয়ার সময় মাত্রাজ্ঞানহীন, অমিতাচারে উৎফুল্ল আর বিশেষভাবে অকপট স্বভাবের। জাদিগকে তার খুব পছন্দ হলো; তার কথাবার্তা বেশ জমে উঠছিল আর খেতে খেতে সারাক্ষণ কথাবার্তা চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত আর্বোগাদ জাদিগকে বললেন, 'আপনাকে ভালো কথা বলছি, আপনি আমার দলে ঢুকে পড়ুন, এর চেয়ে ভালো কাজ আপনি আর খুঁজে পাবেন না। এ পেশাটা খুব খারাপ নয়, আমি এখন যা হয়েছি একদিন আপনি তাই হতে পারবেন।'

জাদিগ বললেন, 'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি? কবে থেকে আপনি এই মহৎ পেশাটি গ্রহণ করেছেন?'

দুর্গাদিশ আবার বলে যেতে লাগলেন, 'খুবই অল্প বয়স থেকে। আমি ছিলাম বেশ চালাক-চতুর এক আরবের খানসামা, নিজের অবস্থাটা আমার অসহ্য লাগত। গোটা পৃথিবীর ওপর সমস্ত মানুষের সমান অধিকার রয়েছে, এখানে অদৃষ্ট কোথাও আমার ভাগটা আলাদা করে রাখল না দেখে হতাশ হয়ে যেতাম। বুড়ো এক আরবকে আমার দুঃখের কথা জানালাম।

তিনি আমায় বললেন, 'বাছা হতাশ হয়ো না; বহুকাল আগে এক বালুকণা ছিল, মরুভূমির বুকে নাম-গোত্রহীন বালুর কণা হওয়ার জন্য সে দুঃখ করত, কয়েক বছর পর সে হয়ে গেল হীরে, আর এখন সে ভারতবর্ষের রাজার মুকুটের সবচেয়ে সুন্দর মণি।'

কথাটা আমার মনে বেশ দাগ কাটে; ছিলাম বালুর কণা, ঠিক করলাম হিরে হব। দুটো ঘোড়া চুরি করে আমি শুরু করলাম, কিছু সঙ্গী জোটালাম, ছোটখাটো যাত্রীদলকে লুট করার সামর্থ্য হলো, এভাবে একটু একটু করে মানুষের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য ছিল প্রথমে তা দূর করলাম। পৃথিবীর সম্পদের ভাগ পেলাম, বলতে গেলে আমায় সুদ সমেত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে, আমি একটা কেউকেটা বনে গেলাম। হয়ে উঠলাম ডাকাত-জমিদার। বাহুবলে এই দুর্গপ্রাসাদ আমি দখল করে নিলাম। সিরিয়ার সামন্ত আমার কাছ থেকে দুর্গটা কেড়ে নিতে চাইলেন; কিন্তু আমি এমন ধনী হয়ে উঠেছিলাম যে ভয় করার মতো আমার আর কিছুই ছিল না; সামন্তকে আমি টাকা দিলাম, এই উপায়ে দুর্গটা আমি দখলে রাখলাম আর নিজের অধিকার আরও বিস্তৃত করলাম। এমনকি পার্বত্য আরব থেকে মহারাজ যে কর পেতেন সামন্ত আমাকে তার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। কর আদায়কারীর দায়িত্ব আমি পালন করলাম, করদাতার কর্তব্য বিন্দুমাত্র নয়।

রাজা মোয়াবদারের নাম করে ব্যাবিলনের মহাদেস্তেরাম আমায় গলা টিপে মারার জন্য ছোটখাটো এক সামন্তকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। সে তার লোকজন নিয়ে উপস্থিত হলো; সবটাই আমি জানতাম। লোকটির চোখের সামনে তার সঙ্গে আনা চারজন লোককে গলা টিপে মারলাম, লোকগুলোকে সে এনেছিল গলায় ফাঁস পরিয়ে টানার জন্য। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে গলা টিপে মারার জন্য সে কত টাকা দক্ষিণা পাবে। জবাবে সে বলল, তার পারিতোষিক তিনশ মোহরের মতো হতে পারে। আমি তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার সঙ্গে থাকলে সে আরও বেশি রোজগার করতে পারে। তাকে আমি আমার অধিনস্থ দস্যু বানালাম; আজ সে হলো আমার সবচেয়ে সেরা আর সবচেয়ে ধনী কর্মীদের একজন। যদি

আমার কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আপনিও তার মতো উন্নতি করতে পারবেন। মোয়াবদার মারা পড়ছেন আর ব্যাবিলনে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, ফলে লুটতরাজের এমন মওকা আর কখনো আসেনি।'

জাদিগ বললেন, 'মোয়াবদার মারা পড়েছেন! আর রানি আস্তার্তের কী হলো?'

আর্বোগাদ বলতে লাগলেন, 'সেসবকিছুই আমি জানি না, এইটুকু বলতে পারি যে মোয়াবদারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আর তিনি মারা পড়েছেন, ব্যাবিলন বিরাট একটা খুনোখুনির আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে, গোটা সাম্রাজ্যটা ছারখার, এখনও বেশ দাও মারা যায়, আর আমার কথা বলতে গেলে, দারুণ কিছু দাও আমি মেরেছি।'

জাদিগ বললেন, 'কিন্তু রানি? দোহাই আপনার, রানির কপালে কী ঘটল তার কিছুই কি আপনি বলতে পারেন না?'

আর্বোগাদ বলতে লাগলেন, 'ইর্কানির এক রাজার কথা লোকে আমায় বলেছে, হই-হাঙ্গামার মধ্যে মারা না পড়লে রানি সম্ভবত তার মেয়েমানুষদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। তবে খবরাখবরের চেয়ে লুটের মালে আমার আগ্রহটা বেশি। আচমকা হানা দিয়ে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে আমি তুলে এনেছিলাম; তাদের কাউকে আমি রেখে দেই না, কে কি খবর না নিয়ে সুন্দরী হলেই আমি তাদের চড়া দামে বেচে দেই। কেউ পদগৌরব কেনে না, কোনো রানি যদি দেখতে খারাপ হয় তাহলে তার খদ্দের জুটবে না। হয়তোবা আমিই রানি আস্তার্তেকে বিক্রি করে দিয়েছি, হয়তো তিনি মারা গেছেন, তবে তাতে আর কী আসে যায়, আর আমার ধারণা এসব নিয়ে আপনারও আমার চেয়ে বেশি মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

এরকম সব কথা বলতে বলতে আর্বোগাদ মদ খেতে থাকলেন, তখন সমস্ত ভাবনা তিনি এমন গুলিয়ে ফেলতে লাগলেন যে জাদিগ তার থেকে স্পষ্ট কোনো কিছু বের করতে পারলেন না।

জাদিগ স্তব্ধ, চিন্তাক্লিষ্ট, নিঃস্পন্দ হয়ে রইলেন। আর্বোগাদ দারুণ উৎসাহে তখনও মদ খেয়ে চলেছেন, গল্প করছেন আর অবিরত বলে যাচ্ছেন যে তিনি সবচেয়ে সুখী পুরুষ; জাদিগকে তিনি তার মতো সুখী হতে উৎসাহ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মদের ঘোরে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলেন। চরম অস্থিরতার মধ্যে জাদিগ রাত কাটালেন।

তিনি ভাবতে লাগলেন কী অদ্ভুত কাণ্ড! রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেল! তিনি মারা পড়লেন! তার জন্য দুঃখ না করে পারছি না! সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে গেল আর এই ডাকাতরা তাতে খুশি; হায়রে সম্পদ! হায়রে নিয়তি! একজন লুটেরা সুখী আর প্রকৃতির সবচেয়ে মন ভোলানো সৃষ্টি হয়তোবা বীভৎসভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে নয়তো মরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ অবস্থায় টিকে আছে! আস্তার্তে! তোমার কী যে পরিণাম ঘটল?'

দিনের আলো দেখা দিতে না দিতেই দুর্গের ভেতর যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই জাদিগ প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু সবাই ব্যস্ত, কেউ তার কথার জবাব দিল না : রাতে তারা নতুন নতুন লুটতরাজ করছে, লুটের মালের ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছিল। এই হট্টগোলের মধ্যে জাদিগ কোনোমতে শুধু তার বিদায়ের অনুমতি আদায় করতে পারলেন। তিনি অবিলম্বে সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন, আর বেদনাদায়ক চিন্তার মধ্যে একান্তভাবে ডুবে গেলেন।

উদ্বিগ্ন আর অস্থির জাদিগ পথ চলতে লাগলেন। দুঃখিনী আস্তার্তে, ব্যাবিলনের রাজা, বিশ্বস্ত কাদর, সুখী দস্যু আর্বোগাদ, মিশর সীমান্তে ব্যাবিলনীয়রা যাতে ধরে নিয়ে গেল সেই চপল নারী, সবশেষে তার নিজের জীবনের তাবৎ দুঃসময় আর দুর্ভাগ্য, এ সমস্ত ব্যাপার তার অন্তর সম্পূর্ণ ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

জেলে

আর্বোগাদের দুর্গ থেকে কয়েক ক্রোস এগিয়ে জাদিগ ছোট্ট এক নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন। তখনও তিনি নিজের অদৃষ্ট নিয়ে দুঃখ করছিলেন আর নিজেকে দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তি বলে ভেবে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, একটি জেলে নদীর ধারে শুয়ে রয়েছে; শান্ত হাতে কোনোরকমে সে নিজের জালটা সে ধরে আছে। মনে হচ্ছে সে যেন জালটা ফেলে দিচ্ছে, তার দৃষ্টি আকাশের দিকে।

জেলেটা বলে যাচ্ছিল, সমস্ত মানুষের মধ্যে আমিই নিশ্চয় দুঃখী। আমি ছিলাম ব্যাবিলনের সবচেয়ে নামি পনীরওয়ালা, সবাই এ কথাটা মানত, আর সর্বস্ব আমি খোয়ালাম। আমার স্ত্রী ছিল সেরা সুন্দরী, আমার মতো লোকের ওর চেয়ে সুন্দর স্ত্রী হয় না, আর সে কি না আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। শেষমেষ আমার সামান্য

একটা বাড়ি ছিল, সেটাও আমার চোখের সামনে লুট হয়ে গেল আর ধ্বংস হলো। একটি কুটিরে আমি আশ্রয় নিলাম, মাছ ধরা ছাড়া আমার আর কোনো গতি রইল না, আর একটা মাছও আমি পাই না। আমার জাল, তোকে আমি আর পানিতে ফেলব না, আমি নিজেই পানিদে ঝাঁপ দেব।'

কথাগুলো বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল আর প্রাণ দিতে যাওয়া মানুষের মতো দ্রুত এগিয়ে গেল।

জাদিগ মনে মনে ভাবলেন কী আশ্চর্য! আমার মতো দুঃখী লোকও তাহলে আছে।' এই চিন্তা মতো তড়িৎগতিতে দেখা দিল তার ঐ লোকটাকে বাঁচানোর আগ্রহ। জাদিগ ছুটে গিয়ে তাকে আটকালেন, সহানুভূতি আর সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। একা দুঃখী না হলে লোকে নিজেকে কম দুঃখী বলে ভাবে; কিন্তু জরাথ্রুস্ট বলেছেন ব্যাপারটা অনিষ্ট করার বাসনা থেকে আসে না, আসে প্রয়োজন থেকে। নিজের সমগোত্রীয়ের মতোই লোকে অন্য একজন হতভাগ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাগ্যবানের আনন্দ অপমান হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু দুজন দুঃখী ছোট দুটি দুর্বল গাছের মতো—একে অন্যের ওপর ভর করে ঝড়ের বিরুদ্ধে শক্তিমান হয়ে উঠে।

জাদিগ লোকটিকে বললেন, 'দুর্ভাগ্যে হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

লোকটি জবাব দিল, 'কারণ আমি যে তার কোনো উপায় দেখছি না, ব্যাবিলনের কাছাকাছি দেলবাক গ্রামের আমি ছিলাম সবচেয়ে গণ্যমান্য লোক, আমার স্ত্রী আমায় সাহায্য করত আর আমি রাজ্যের সেরা মালাইওয়ালা পনীর তৈরি করতাম। রানি আস্তার্তে তার বিখ্যাত মন্ত্রী জাদিগ ঐ পনীর খুবই পছন্দ করতেন। তাদের বাড়িতে আমি ছয়শ পনীর দিয়েছিলাম, দামটা আনার জন্য একদিন শহরে গেলাম, ব্যাবিলনে পৌঁছে শুনলাম যে রানি আর জাদিগ উধাও। ছুটতে ছুটতে জাদিগ মশাইয়ের বাড়ি গেলাম, তাকে আমি কখনো দেখিনি। দেখলাম মহাদেস্তোরামের তিরন্দাজ সেপাইরা রাজার একটা পরোয়ানা নিয়ে অনুগতভাবে এবং শৃঙ্খলা মেনে জাদিগের বাড়ি লুপ করছে। রানির পাকশালে ছুটলাম; রাঁধুনি মশাইয়ের কেউ কেউ আমায় জানালেন যে, রানি মারা গেছেন, আবার কয়েকজন বললেন যে, তিনি কারাগারে, আর কারও কারও মতে তিনি পালিয়েছেন, তবে সবাই আমায় এ কথাটি জানিয়ে দিলেন যে, পনীরের দামটা আমি পাব না। স্ত্রীকে সঙ্গে করে অর্ক মশাইয়ের বাড়ি গেলাম, তিনি ছিলেন আমার বাঁধা খদ্দেরদের একজন। আমাদের ঐ দুর্দশায় তার কাছে আশ্রয় চাইলাম। তিনি আমার স্ত্রীকে আশ্রয় দিলেন, আমাকে বিদায় দিলেন। আমার স্ত্রীর গায়ের রঙ আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ মালাইওয়ালা পনীরের চেয়ে ফরসা ছিল আর সে গোলাপি আভা তাকে প্রাণবন্ত করে তুলত তার কাছে ফিনিসীয় রক্তরাগ নিষ্প্রভ হয়ে যেত। এসব গুণের কারণেই অর্ক তাকে রেখে দিলেন আর আমাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। নিরুপায় হয়ে আমি আমার প্রিয় পত্নীকে একটি চিঠি লিখলাম।

আমার স্ত্রী পত্রবাহককে বলল, 'ওহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, যে লোকটি আমায় চিঠি লিখেছে তার কথা আমি শুনেছি। লোকে বলে সে নাকি দারুণ মালাইওয়ালা পনীর বানায়; আমার কাছে যেন কিছুটা পনীর আনা হয়, তার জন্য ওকে দাম দিয়ে দেওয়া হবে।'

এই দুভার্গ্যে আমি আদালতের দারস্থ হতে চাইলাম। আমার কাছে অবশিষ্ট ছিল ছয়টা সোনার মোহর, যে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করলাম তাকে ওর থেকে দুটি মোহর দিতে হলো। যে মোক্তার মামলাটা নিল তাকে দিত হলে দুটি মোহর, আর দুটি মোহর দিতে হলো বড় হাকিমের পেশকারকে। এসব শেষ হওয়ার পরও আমার মামলা শুরু হলো না, আর ইতোমধ্যে আমি যতটা পয়সা খরচ করে ফেলেছি আমার পনীর আর স্ত্রীর দাম ততটা নয়। স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য নিজের বাড়িটা বেচার উদ্দেশ্যে আমি আমার গ্রামে ফিরে গেলাম।

আমার বাড়ির দাম হতো অন্তত ষাট মোহর। কিন্তু লোকে দেখলে আমি গরিব আর তড়িঘড়ি বেচতে চাই। প্রথমে যার কাছে কথাটা পাড়লাম সে আমার তিরিশ মোহর দর দিল, দ্বিতীয় জন বলল বিশ মোহর আর তৃতীয়জন দশ। আমি এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে শেষ পর্যন্ত রফা করতে রাজি হলাম; ঠিক সেই সময় ইর্কানির এক রাজা ব্যাবিলনে এসে হাজির হলেন আর আসার পথে সমস্ত ছারখার করে দিলেন। আমার বাড়িটা প্রথম লুটতরাজ করে তছনছ করা হলো, তারপর বাড়িটা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো।

এমনি করে টাকাপয়সা, বউ আর ঘরবাড়ি খুইয়ে আমি এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিলাম, আপনি আমাকে এখানেই দেখতে পাচ্ছেন। জেলের কাছ থেকে কোনোরকমে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করলাম, মানুষের মতো মাছগুলোও আমায় নিয়ে

মজা করছে : কিছুই ধরতে না পেরে আমি খিদেয় মরতে বসেছি; আর, মহামান্য সান্ত্বনাদাতা, আপনি না থাকলে আমি নদীতে প্রাণ দিতে যাচ্ছিলাম।'

জেলেটি একনাগাড়ে গল্পটি বলে ফেলেনি; কেননা প্রতি মুহূর্তে বিহ্বল আর চিন্তিত জাদিগ তাকে বলেছিলেন, 'কী! রানির কপালে কী ঘটল তার কিছুই তুমি জানো না?'

ছেলেটি জবাব দিচ্ছিল, 'না, হুজুর, তবে জানি রানি আর জাদিগ আমার মালাইওয়ালা পনীরের দামটা দিলেন না, আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে আর আমার কোনো গতি নেই।'

জাদিগ বললেন 'আমার মনে হয়, সবটা পয়সা তুমি খোয়াবে না, ঐ জাদিগের কথা আমি লোকের মুখে শুনেছি; তিনি খাঁটি লোক; আর তিনি ব্যাবিলনে ফিরে যাবেন ভাবছেন, ফিরলে তিনি তোমার পাওনার বেশি মিটিয়ে দেবেন; তবে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তোমায় পরামর্শ দেব তাকে তুমি আর ঘরে নিয়ে যেতে চেয়ো না, তার স্বভাবটা তেমন ভালো নয়। আমার কথা শোনো ব্যাবিলনে যাও; সেখানে আমি তোমার আগে হাজির হব, কেননা আমি যাব ঘোড়ায় চেপে আর তুমি পায়ে হেঁটে। বিখ্যাত কাদরের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলো যে তার বন্ধুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে; তার বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা কর, যাও, হয়তো তোমাকে চিরদিন দুঃখী হয়ে জীবন কাটাতে হবে না।'

তিনি বলতে লাগলেন, 'হে মহাশক্তিমান অরোসমাদ, আমকে দিয়ে ঐ লোকটিকে তুমি সান্ত্বনা দিলে, আমায় সান্ত্বনা দেবে কাকে দিয়ে?'

বলতে বলতে জাদিগ আরব দেশ থেকে আনা অর্থের অর্ধেকটা জেলেটিকে দিয়ে দিলেন। হতবুদ্ধি আর আনন্দে আত্মহারা জেলেটি কাদরের বন্ধুর পায়ে বারবার চুমু খেয়ে বলতে লাগল, 'আপনি প্রাণদাতা দেবদূত।'

জাদিগ অবশ্য তখনও খবরাখবর নিতে নিতে চোখের জল ফেলছিলেন।

জেলেটি বলে উঠল 'সত্যি, কী অদ্ভুত! আপনি পরোপকার করছেন, অথচ সেই আপনিও কি তাহলে সমান দুঃখী?'

জবাবে জাদিগ বললেন, 'তোমার চেয়ে শতগুণ দুঃখী।'

সরল লোকটি বলল, 'সে কী করে হয়? যে দান করেছে তার কষ্টটা যে দান নিচ্ছে তার চেয়ে বেশি কী করে হবে?'

জাদিগ আবার বললেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল অভাব, আর আমার দুর্ভাগ্যটা হৃদয়ের ব্যাপার।'

জেলে বলল, 'অর্ক কি আপনার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে?'

কথাটা জাদিগকে তার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিল। রানির কুকুর থেকে দস্যি আর্বোগাদের আস্তানায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত নিজের দুর্ভাগ্যের তালিকা আরেকবার তিনি মনে মনে আউড়ে গেলেন।

তিনি জেলেকে বললেন, 'আহ! অর্কর শাস্তি পাওয়াই উচিত। তবে এই লোকগুলোই সাধারণত নিয়তির প্রিয়পাত্র হয়। সে যাই হোক, তুমি কাদর মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর।'

তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন : নিজের অদৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জেলেটি হাসতে লাগল আর অদৃষ্টকে দোষারোপ করতে করতে জাদিগ ছুটতে থাকলেন।

বাজিলিক

ঘাসে ঢাকা সুন্দর এক প্রান্তরে এসে জাদিগের চোখে পড়ল কয়েকজন স্ত্রীলোক খুব মন দিয়ে কী যেন খুঁজছে। তিনি সাহস করে তাদের একজনের কাছে এগিয়ে গেলেন, জানতে চাইলেন খোঁজার ব্যাপারে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন কি না; সাহায্য করতে পারলে তিনি তা সৌভাগ্য বলে মনে করবেন।

সিরিয়া দেশের স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনাকে কিছু করতে হবে না,' আমরা যা খুঁজছি তা কেবল মেয়েরাই ছুতে পারে।'

জাদিগ বললেন, খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একমাত্র মেয়েরাই ছুতে পারবে এমন জিনিসটা কী তা আমায় বলবেন কি?'

মেয়েটি বলল, 'বাজিলিক।'

'বাজিকিক? আর দয়া করে বলুন তো আপনার বাজিলিকটা খুঁজছেন কেন?

'আমাদের মনিব অগুল মশাইয়ের জন্য, মাঠের শেষে নদীর ধারে আপনি তারই দরদালান দেখতে পাচ্ছেন। আমরা তার অতি নগণ্য দাসী। অগুল মশাইয়ের অসুখ। কবিরাজ তাকে গোলাপ জলে রাঁধা বাজিলিক খাওয়ার বিধান দিয়েছেন।

বাজিলিক খুবই দুষ্প্রাপ্য প্রাণী আর তা কেবল মেয়েদের হাতেই ধরা পড়ে। তাই অগুল মশাই কথা দিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে তাকে বাজিলিক এনে দিতে পারবে তাকেই তিনি প্রিয়তমা পত্নী হিসেবে বেছে নেবেন। দয়া করে আমায় খুঁজতে দিন। কেননা সঙ্গিনীরা আমায় হারিয়ে দিলে তার জন্য কি দামটা আমায় দিতে হবে তা আপনি বুঝতে পারছেন।'

ঐ সিরীয় স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য সবাইকে বাজিলিক খুঁজতে দিয়ে জাদিগ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ছোট একটি নদীর ধারে পৌছে তার চোখে পড়ল অন্য একটি মহিলা ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, আর কিছুই সে খুঁজছে না। তার আকৃতিটা যেম সম্ভ্রম জাগায়, তবে তার মুখ একটা ওড়নায় ঢাকা, সে নদীর দিকে ঝুলে ছিল, তার মুখ থেকে গভীর দ্বীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল। তার হাতে ছোট্ট একটি কাঠি, ঐ কাঠি দিয়ে সে নদী আর ঘাসের মাঝখানের নরম বালির ওপর আঁচড় কেটে কয়েকটা অক্ষর লিখেছিল। স্ত্রীলোকটি কী লিখছে তা দেখার জন্য জাদিগের কৌতূহল হলো। তিনি এগিয়ে গেলেন, দেখতে পেলেন জ অক্ষর, তারপর আকার : তিনি অবাক হলেন, তারপর দেখলেন দি : তিনি চমকে উঠলেন। নিজের নামের শেষ অক্ষর দেখে যে বিস্ময় তিনি অনুভব করলেন তার কোনো তুলনা হয় না।

কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন, অবশেষে নীরবতা ভেঙে ধরা গলায় বললেন, 'দয়াময় নারী, আপনার দিব্য হাতের আঁচড়ে লেখা জাদিগের নাম আমি দেখতে পাচ্ছি, এর পিছনে আশ্চর্য কোনো ঘটনা রয়েছে কি না তা আমার জানার ইচ্ছা রয়েছে। একজন হতভাগ্য বিদেশির এই ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।'

এই উক্তি, এই কণ্ঠস্বর শুণে স্ত্রীলোকটি কম্পিত হাতে ঘোমটা তুলে জাদিগের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, সেই চিৎকার ভালোবাসা, বিস্ময় ও আনন্দের। আর তার অন্তরে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া বিচিত্র আবেগের ঘোরে স্ত্রীলোকটি জাদিগের বুকে লুটিয়ে পড়ল।

এই নারী স্বয়ং আস্তার্তে, ব্যাবিলনের রানি। ইনিই জাদিগের ধ্যানজ্ঞান, আর একে ধ্যানজ্ঞান করার জন্য জাদিগ নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করেছেন, ইনিই সেই নারী যার জন্য জাদিগ এত কেঁদেছেন আর অদৃষ্টকে এত ভয় করেছেন। ক্ষণিকের জন্য জাদিগের সমস্ত চেতনা লোপ পেল; আর তার চোখ আস্তার্তের চোখের ওপর নিবদ্ধ হলো। দিশেহারা ভাব আর ভালোবাসা মেশানে, অবসাদে ভরা আস্তার্তের চোখ দুটি আবার খুলছিল। তখন জাদিগ বলে উঠলেন, 'দুর্বল মানুষের ভাগ্যবিধাতা অবিনশ্বর দেবতারা, তোমরা কি আমার আস্তার্তকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? কোন সময়ে, কোন স্থানে, কী যে অবস্থার পরিনতিতে আমি তাকে চোখে দেখছি?'

তিনি আস্তার্তের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আস্তার্তের পায়ের ধুলো কপালে ঠেকালেন। ব্যাবিলনের রানি তাকে উঠিয়ে নদীর তীরে নিজের কাছে বসালেন। চোখ থেকে অবিরাম জল পড়ছিল জাদিগের আর আস্তার্তে কয়েকবার জল মুছিয়ে দিলেন। আস্তার্তে বিশবার গোড়া থেকে কথা শুরু করলেন, এক চাপা কান্না বারবার তাকে বাধা দিচ্ছিল। ঘটনাচক্রে কীভাবে যে তাদের মিলন ঘটল এ সম্পর্কে তিনি জাদিগকে প্রশ্ন করেছিলেন, আর জাদিগের জবার দেওয়ার আগে হঠাৎ আরও প্রশ্ন করেছিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তিনি একটু একটু করে বলছিলেন আর জাদিগের কাহিনি শুনতে চাইছিলেন। অবশেষে তারা দুজনেই নিজেদের হৃদয়ের প্রচণ্ড আলোড়ন কিছুটা প্রশমিত করলেন। তখন কী করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জাদিগ এই প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন তার ইতিহাস দুচার কথায় রানিকে জানালেন।

'কিন্তু অভাগিনী শ্রদ্ধেয়া রানি, কী করে আপনি এই নিভৃত স্থানে এলেন? আপনার পরনে ক্রীতদাসীর পোশাক আর আপনার সঙ্গে রয়েছে আরও সব ক্রীতদাসী, ওর সব কবিরাজের বিধানে গোলাপজলে রাঁধার জন্য বাজিলিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

সুন্দরী আস্তার্তে বললেন, 'ওরা বাজিলিক খুঁজতে থাকুক, ইতোমধ্যে আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কথা আমি আপনাকে বলছি, আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর ঐ দুর্ভাগ্যের জন্য দৈবের সমস্ত দোষ আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। আপনি তো জানেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হওয়াটা আমার স্বামী রাজা ভালো চোখে দেখেননি। আর এই কারণে একদিন রাতের বেলা তিনি আপনাকে ফাঁস পরিয়ে আর আমাকে বিষ খাইয়ে মারবেন বলে স্থির করলেন। আপনি তো জানেন কীভাবে দৈবের কৃপায় আমার খুদে বোবাটা মহারাজের আদেশ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেয়। বিশ্বাসী বন্ধু কাদর আপনাকে জোর করে আমার কথা মেনে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন, ঠিক তারপরই গুপ্তপথে মাঝরাতে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে নিয়ে গেলেন অরোস্মাদের মন্দিরে। সেখানে কাদরের ভাই মন্দিরের মোহান্ত তিনি আমায় লুকিয়ে রাখলেন বিরাট এক মূর্তির ভিতর; সেই মূর্তির তলাটা মন্দিরের ভিত ছুঁয়েছে আর মাথাটা গম্বুজ পর্যন্ত। কবর দেওয়া লোকের মতো আমি তার মধ্যে রইলাম, তবে

মোহান্ত আমার দেখাশোনা করতেন আর দরকারী কোনো জিনিসের আমার অভাব হতো না। ইতোমধ্যে, ভোরের আলো দেখা দিতেই মহারাজের বিষবৈদ্য খোরসানী যমানী, আফিং, কিরদামনা, কটু রোহিনী আর কাঠ জহর মেশানো একটি পাঁচন নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল আর অন্য একজন রাজপুরুষ নীল রেশমের ফাঁস হাতে আপনার বাড়ি গেল। কাউকে পাওয়া গেল না। রাজাকে বিশেষ করে ভুল বোঝানোর জন্য কাদর তার কাছে গিয়ে আমাদের দুজনের নামে নালিশ করার ভান করলেন। তিনি বলে এলেন আপনি ভারতবর্ষের পথে গেছেন আর আমি মেমফিসের পথে; আপনার আর আমার খোঁজে চর পাঠানো হলো।

যে দূতরা আমায় খুঁজতে গিয়েছিল তারা আমায় চিনত না। স্বামীর আদেশে এবং তার উপস্থিতিতে একমাত্র আপনার কাছে ছাড়া আর কাউকে কখনো আমি আমার মুখ দেখাইনি। আমার চেহারার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে ওরা আমার খোঁজে ছুটেছিল : মিশরের সীমান্তে ঠিক আমার মতো গড়ন একটি স্ত্রীলোক তাদের নজরে পড়ল, সে বোধ করি আমার চেয়ে বেশি রূপসি ছিল। স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঐ স্ত্রীলোকটি আদৌ ব্যাবিলনের রানি কি না সে নিয়ে দূতদের কোনো সন্দেহ হলো না, তারা তাকে মোয়াবদারের কাছে নিয়ে এলো। তাদের ভুলে রাজা প্রথমে প্রচণ্ড চটে গেলেন। কিন্তু একটু বাদে আরও কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখে স্ত্রীলোকটিকে তার খুবই সুন্দর বলে বোধ হলো এবং তিনি সান্ত্বনা পেলেন। লোকে স্ত্রীলোকটিকে মিসুফ বলে ডাকত, পরে শুনেছি মিশরীয় ভাষায় ঐ নামের মানে 'খামখেয়ালী রূপসি'। স্ত্রীলোকটি সত্যি সত্যি তাই ছিল, তবে ওর খামখেয়ালির মতোই ছিল ছলাকলা। তাকে মোয়াবদারের ভালো লেগে গেল। মোয়াবদারকে সে এমন বশ করে ফেলল যে তিনি ওকে স্ত্রী বলে ঘোষণা করে দিলেন। তখনই তার স্বভাব পুরোটা বেরিয়ে পড়ল। মাথায় উদয় হওয়া তাবৎ পাগলামি নিয়ে সে নির্ভয়ে মেতে উঠল। বুড়ো আর বাতের রোগী প্রধান পুরোহিতকে সে নিজের সামনে জোরদার করে নাচাতে চাইল, বৃদ্ধ অস্বীকার করলে সে তাকে প্রচণ্ড ভোগাল। ঘোড়াশালের রক্ষককে সে মোরব্বার পিঠে তৈরি করতে আদেশ দিল। বৃথাই ঘোড়াশালের রক্ষক নিবেদন করলেন যে তিনি হালুইকর নয়, পিঠে

চালাতে থাকল। সবাই আমার জন্য দুঃখ করতে লাগল। আমাকে বিষ খাইয়ে আর আপনাতে ফাঁস পরিয়ে মারতে চাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ হিসেবে রাজা যথেষ্ট সৎ ছিলেন। মনে হচ্ছিল খামখেয়ালি ঐ সুন্দরীর প্রচণ্ড ভালোবাসার মধ্যে সমস্ত গুণই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। পবিত্র অগ্নিপূজার পুণ্য দিনে তিনি মন্দিরে এলেন। দেখতে পেলাম, আমি যে মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম তার পায়ের তলায় রাজা মিসুফের জন্য দেবতাদের প্রার্থনা কৃপা করছেন।

চড়া গলায় চিৎকার করে তাকে আমি বললাম, 'শেষমেষ চপলস্বভাব একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করার জন্য যিনি সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণনাশ করতে চেয়েছেন, যিনি স্বৈরাচারীতে পরিণত হয়েছেন সেই রাজার মানত দেবতারা প্রত্যাখ্যান করেন।'

এ কথায় মোয়াবদার এমন বিচলিত হলেন যে তার মাথায় গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল। আমার মুখ থেকে বার হওয়া দৈববাণী আর মিসুফের স্বেচ্ছাচার তার বিচার-বুদ্ধি লোপ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি পাগল হয়ে গেলেন।

দেবতার দণ্ড বলে মনে হওয়ায় তার উন্মত্ততা বিদ্রোহের সংকেত হয়ে দাঁড়াল। লোকে বিদ্রোহী হয়ে অস্ত্র হাতে নিল। এতকাল নিষ্ক্রিয় জড়তার মধ্যে ডুবে থাকা ব্যাবিলন ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত হলো। কাদর মেমফিসে ছুটল আপনাকে ব্যাবিলনে ফিরিয়ে আনার জন্য। এসব ভয়ানক খবর শুনতে পেয়ে ইর্কানির রাজা তৃতীয় দল হিসেবে সসৈন্যে কাল্ডিয়াতে এসে উপস্থিত হলো। সে যখন মহারাজকে আক্রমণ করল তখন তিনি তার অস্থিরচিত্ত মিশরীয় স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে ইর্কানির রাজার সামনে দিয়ে ছুটতে লাগলেন। অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মোয়াবদার মারা পড়লেন। মিসুফ বিজয়ীর হাতে ধরা পড়ল। কপাল-দোষে আমি নিজেও একটি ইর্কানীয় দলের হাতে ধরা পড়লাম। আর যে মুহূর্তে মিসুফকে ইর্কানির রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক তখনই আমাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন যে ইর্কানির রাজার মিশরীয় স্ত্রীলোকটির চেয়ে আমাকে বেশি সুন্দরী বলে মনে হলো, তবে একথা শুনে আপনার রাগ হবে যে আমাকে সে তার হারেমে পাঠিয়ে দিল যে সে যুদ্ধে যাচ্ছে, অভিযানটা শেষ করেই সে আমার কাছে আসবে। আমার কষ্টটা একবার ভাবুন। মেয়াবদারের সঙ্গে সম্পর্ক

মতো লোকদের চরিত্রে এক ধরনের মহিমা নিয়ে থাকেন, তার ফলে যখন দুর্বিনীত লোকেরা সম্মান জানাতে ভুলে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখায় তখন একটি কথায়, একটি বারের চকিত চাউনিতে ঐ চারিত্রিক মহিমাই নাকি তাদের আবার গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে দেয়। আমি রানির মতো কথা বললাম অথবা পরিচারিকার ব্যবহার পেলাম। ইর্কানীয় লোকটি আমাকে কিছু বলার করুণাটুকুও করল না, কেবল তার হাবশি খোঁজাকে বলল যে আমি একটি উদ্ধত স্বভাবের স্ত্রীলোক, তবে আমাকে তার সুন্দরী বলে মনে হয়েছে। সে খোঁজাটিকে আমার যত্ন নিতে এবং আমাকে তার প্রিয়পাত্রীদের মতো খাবারদাবার দিতে নির্দেশ দিল, তাতে আমার গায়ের রঙ আরও চকচকে হবে। আর সে যেদিন তার অনুগ্রহে আমায় কৃতার্থ করার সুযোগ পাবে সেদিন আমি তার অনুগ্রহের উপযুক্ত হব। তাকে আমি জানালাম আমি প্রাণ দেব। সে হেসে জবাব দিল যে প্রাণ কেউই দেয় না, এসব সে অনেক দেখেছে, আর লোকে একটি টিয়াপাখিকে যেরকম পাখির ঘরে রেখে যায়, সেভাবে সে আমায় রেখে গেল। জগতের প্রধান রানির কী দুরবস্থা আর, বলতে পারি, কী যে দুরবস্থা জাদিগকে সঁপে দেওয়া একটি হৃদয়ের।'

এ কথা শুনে জাদিগ তার হাঁটুতে লুটিয়ে পড়ে হাঁটু দুটি চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন।

আস্তার্তে সযত্নে তাকে উঠিয়ে বলতে লাগলেন, 'দেখতে পেলাম আমি এক বর্বরের কবলে, এ উন্মাদ স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্দি আর ঐ স্ত্রীলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী। স্ত্রীলোকটি আমাকে তার মিশরের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। আপনার চেহারার যে বর্ণনা সে দিল, সে সময়ের কথা বলল, যে উটের পিঠে আপনি চড়েছিলেন জানাল তাতে সমস্ত পারিপার্শ্বিকের কথা বিচার করে আমি ধরে নিলাম যে জাদিগই তার পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছিল। আপনি যে মেমফিসে নেই এমন কোনো সন্দেহ আমার হলো না; আমি সেখানে যাব স্থির করলাম।

এ স্ত্রীলোকটিকে আমি বললাম, 'সুন্দরী মিসুফ, তোমার রূপ সত্যি আমার চেয়ে অনেক বেশি মনমাতানো, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে ইর্কানির রাজার মন ভোলাতে পারবে। আমার পালানোর উপায় করে দাও, তুমি একেশ্বরী হয়ে থাকবে; তুমি আমাকে সুখী করবে আর নিজেও প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে নিস্তার পাবে।'

আমার সঙ্গে বসে মিসুফ আমার পালানোর উপায় বার করল। তখন একটি মিশরীয় দাসী নিয়ে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম।

ইতোমধ্যে আমি যখন আরব দেশের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন আর্বোগাদ নামে এক বিখ্যাত লুটেরা আমায় ধরে নিয়ে কিছু বণিকের কাছে বিক্রি করে দিল। বণিকরা আমায় অগুল মশাইয়ের বাস এই দুর্গপ্রাসাদে নিয়ে এলো। আমি কে তা না জেনেই অগুল মশাই আমায় কিনে নিলেন। লোকটি ভোগী, বিপুল ভোজই তার একমাত্র কাম্য, তার ধারণা ঈশ্বর তাকে খাওয়া-দাওয়ার জন্যই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মাত্রাতিরিক্তভাবে মোটা, এর ফলে সারাক্ষণ তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। হজমটা যখন ভালো হয় তখন তিনি কবিরাজকে প্রায় গ্রাহ্য করেন না, যখন খুব বেশি খেয়ে ফেলেন তখন কবিরাজ তাকে যথেষ্ট শাসন করে। কবিরাজ তাকে বুঝিয়েছে গোলাপ-জলে রান্না করা একটা বাজিলিক খাইয়ে সে তাকে সারিয়ে তুলবে। অগুল মশাই কথা দিয়েছিলেন তার দাসীদের মধ্যে যে তাকে বাজিলিক এনে দিতে পারবে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন, দাসীরা এ মর্যাদা পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করছে; তা করুক, আমার কী, আর সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আপনার দেখা পাওয়ার আগেও ঐ বাজিলিক খোঁজার এতটুকু আগ্রহ আমার হয়নি।'

তারপর সবচেয়ে মহৎ আর সবচেয়ে অনুরক্ত দুটি হৃদয়ে যা জাগিয়ে দিতে পারে, এতকালের গোপন করা সেই অনুভূতির সমস্ত কথাই আস্তার্তে আর জাদিগ পরস্পরকে বললেন; আর প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবযোনিরা তাদের কথাগুলো দেবলোকে প্রেমের দেবী ভেনাসের অধিষ্ঠানে পৌঁছে দিল।

কিছুই খুঁজে না পেয়ে স্ত্রীলোকেরা অগ্যুলের বাড়ি ফিরে গেল। জাদিগ অগ্যুলের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'অমরাবতী থেকে অবতীর্ণ অক্ষয় স্বাস্থ্য আপনার প্রতিটি দিনে শুশ্রূষা করুক। আমি চিকিৎসক, লোকের মুখে আপনার অসুস্থতার কথা শুনে ছুটে এসেছি, আর আপনার জন্য নিয়ে এসেছি গোলাপ-জলে রাঁধা একটা বাজিলিক। অবশ্যই আমি আপনাকে বিবাহ করার কথা ভাবছি না। কিছুদিন ধরে ব্যাবিলন থেকে আসা এক ক্রীতদাস আপনার এখানে আছে, আপনার কাছে আমি তার মুক্তি চাইছি। মহান অগ্যুল সুস্থ করার সৌভাগ্য যদি না হয় তাহলে আমি স্বীকার করছি ঐ নারীর জায়গায় আমি নিজে দাসত্ব করব।'

প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। জাদিগের চাকরকে নিয়ে আস্তার্তে ব্যাবিলনে রওনা হলেন, জাদিগকে তিনি কথা দিয়ে গেলেন যে, যা কিছু ঘটবে তা জাদিগকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি লোক পাঠাবেন। তাদের বিদায় সম্ভাষণ তাদের পুনর্মিলনের মতোই মর্মস্পর্শী হলো। জেন্দের মহান গ্রন্থে বলা হয়েছে, মিলন আর বিচ্ছেদের

মুহূর্তই হলো জীবনের দুই পরম লগ্ন। জাদিগ শপথ করে যতটা বলতেন রানিকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন আর রানি যতখানি বলতে পারতেন না জাদিগকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

এদিকে জাদিগ অগুলকে বললেন, 'প্রভু, আমার বাজিলিকটি আপনাকে খেতে হবে না, ওর সমস্ত গুণ রোমকূপ দিয়ে আপনার শরীরে ঢোকাতে হবে। পাতলা চামড়ায় ঢাকা ফেলানো একটা ভিস্তির মধ্যে ওটাকে আমি রেখেছি : সবটুকু শক্তি দিয়ে আপনাকে ঐ ভিস্তিটা ঠেলতে হবে; আপনার কাছে বেশ কয়েকবার ওটা আমি পাঠাতে চাই। আমার বিদ্যে যে কি ঘটাতে পারে সামান্য কয়েকটা দিন বিধিবিধান মেনে চললেই আপনি তা দেখতে পাবেন।'

প্রথম দিনেই অগুল ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়লেন তার মনে হলো, তিনি ক্লান্তিতে মারা যাবেন। পরের দিন তিনি কিছুটা কম ক্লান্ত হলেন আর তার ভালো ঘুম হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ফিরে পেলেন তার সবটা শক্তি, স্বাস্থ্য, ক্ষিপ্রতা আর তার সবচেয়ে উজ্জ্বল বছরগুলোর প্রফুল্লতা।

জাদিগ বললেন, 'আপনি একটি বেলুন নিয়ে খেলা করছেন আর সংযমী হয়ে রয়েছেন, জেনে রাখুন প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও বাজিলিক পাওয়া যায় না। সংযম আর শরীরচর্চাতেই সবসময় শরীর ভালো থাকে। অমিতাচার আর স্বাস্থ্য একসঙ্গে বজায় রাখার বিদ্যেটা অলীক ব্যাপার, যেরকম অলীক স্পর্শমণি, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত জ্যোতিষ আর মোহান্তদের ধর্মতত্ত্ব।'

এই লোকটি চিকিৎসাবিদ্যার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে অগুল-এর প্রধান কবিরাজ জাদিগ পরলাকে বাজিলিক খুঁজতে পাঠানোর জন্য বিষবৈদ্যের সঙ্গে একজোট হলেন। এভাবে সৎ কাজ করার জন্য শাস্তি ভোগ করে, পেটুক এক জমিদারকে সুস্থ করার জন্য জাদিগ প্রাণ হারাতে বসলেন। অতি চমৎকার একটি ভোজে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। দ্বিতীয় পদের সঙ্গে তাকে বিষ দেওয়ার কথা, প্রথম পদ পাতে পড়তেই তিনি সুন্দরী আস্তার্তের কাছ থেকে একটি খবর পেলেন। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে তিনি বিদায় নিলেন।

মহার জরাথ্রুস্ট বলেছেন, 'এ জগতে সুন্দরী নারী যাকে ভালোবাসে সে চিরকাল বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ভাগ্যহীনা সুন্দরী রাজকুলবধূর জন্য চিরকাল লোকের ভাবাবেগ দেখা যায়; সেই আবেগ দিয়ে ব্যাবিলনে রানিকে স্বাগত জানানো হলো। ব্যাবিলনে তখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। ইর্কানির রাজা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। বিজয়ী ব্যাবিলনবাসীরা ঘোষণা করল যে যাকে সম্রাট নির্বাচন করা হবে আস্তার্তে তাকে বিয়ে করবেন। লোকে কিছুতেই চাইছিল না যে জগতের সর্বপ্রধান পদমর্যদা আস্তার্তের স্বামী আর ব্যাবিলনের রাজার আসন ষড়যন্ত্র আর গোপন দলাদলির ওপর নির্ভর করুক। প্রতিজ্ঞা করা হলো, বীরশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠকেই রাজা বলে বরণ করা হবে। নগরী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি যুদ্ধভূমি তৈরি করা হলো, তার ধাপে ধাপে চমৎকার সাজানো আসন। তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধাদের সেখানে উপস্থিত হতে হবে। দর্শকদের আসনের সারির পেছনে থাকবে যোদ্ধাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। সেখানে গিয়ে কেউ তাদের পরিচয় জানতে বা তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। চারজন বল্লমধারীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। চারজন ঘোড়সওয়ার বীরকে পরাস্ত করার সৌভাগ্য হলে যোদ্ধারা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারবেন। এভাবে তিনি রঙ্গভূমির শেষ একেশ্বর হবেন তাকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। এর চারদিন পর একই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাকে মোহন্তদের প্রস্তাবিত প্রহেলিকার উত্তর দিকে আসতে হবে। প্রহেলিকার উত্তর না দিয়ে তিনি কিছুতেই রাজা হতে পারবেন না। এবং ফের বল্লমধারীদের সঙ্গে লড়াই থেকে শুরু করতে হবে। যতদিন না উভয় যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মতো লোক পাওয়া না যায় ততদিন এই চলবে; কারণ রাজপদের জন্য মানুষ চাইছিল শ্রেষ্ঠ বীর আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে। ঐ সময়টা রানিকে কড়া পাহারায় রাখা হবে, ওড়ানার আড়াল থেকে তিনি প্রতিয়োগিতা দেখতে পাবেন, কিন্তু যাতে কোনোরকম পক্ষপাত বা অবিচার করা না হয় সে কারণে তাকে কোনো পাণীপ্রার্থীর সঙ্গে কিছুতেই কথা বলতে দেওয়া হবে না।

এ ব্যাপারটাই আস্তার্তে তার প্রেমাস্পদকে জানিয়েছিলেন। আস্তার্তের আশা, তার জন্য জাদিগ অন্য যে কারও চাইতে বেশি বীরত্ব এবং বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। জাদিগ রওনা হলেন এবং প্রেমের দেবী ভেনাসের কাছে তার সাহসকে সুদৃঢ় আর বোধবুদ্ধিকে দীপ্তিময় করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। সেই চরম দিনটির আগের দিন তিনি ইউফ্রেটিসের তীরে এসে পৌছলেন। নির্দেশ অনুসারে নিজের মুখ ঢেকে তিনি

যোদ্ধাদের প্রতীক চিহ্নের মধ্যে নিজের প্রতীক চিহ্ন লিখিয়ে দিয়ে এলেন আর তার ভাগ্যে যে ঘরটি উঠল সেখানে বিশ্রাম নিতে গেলেন। বন্ধু কাদর মিশরে গিয়ে নিষ্ফলভাবে তাকে খোঁজাখুঁজি করে ব্যাবিলনে ফিরে এসেছিলেন। তিনি জাদিগের ঘরে রানির পাঠানো বর্ম পৌঁছিয়ে দিলেন। রানির হয়ে তিনি জাদিককে আনিয়ে দিলেন সবচেয়ে সুন্দর পারসি ঘোড়া। জাদিগ দেখে বুঝতে পারলেন উপহারগুলো আস্তার্তের পাঠানো। এতে তার সাহস আর ভালোবাসা নতুন শক্তি আর আশায় উদ্বুদ্ধ হলো।

পরদিন, মণি-মুক্তাখচিত এক চাঁদোয়ার নিচে রানি বসলেন, এবং আসনের সবকয়টি সারি ব্যাবিলনের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা আর সর্বস্তরের মানুষে ভরে গেল। যোদ্ধারা তখন রঙ্গভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রতীক চিহ্ন প্রধান মোহান্তের পায়ের কাছে রাখলেন। না দেখে প্রতীকগুলো তোলা হলো, জাদিগের প্রতীক উঠল সবার শেষে। প্রথমে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি খুবই ধনী এক জমিদার, তাঁর নাম ইতোবাদ, দারুণ হামবড়া তার ভাব, তিনি খুবই ভীরু, একান্ত অনাড়ী আর নির্বোধ। চাকরবাকরেরা তাকে বুঝিয়েছিলেন যে তার মতো লোকের রাজা হওয়া উচিত; তিনি তাদের জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার মতো লোকের রাজ্য শাসন করা উচিত।' অতএব তাকে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হলো। সবুজ মিনে করা একটা সোনার বর্ম তিনি পরে ছিলেন, মাথায় ছিল সবুজ পালক, সবুজ ফিতেয় সাজানো একটি বল্লম তার হাতে। ইতোবাদের ঘোড়া সামলানোর কায়দা দেখে গোড়াতেই লোকে বুঝে নিল যে ঈশ্বর ব্যাবিলনের রাজদণ্ড তার মতো লোকের জন্য রাখেননি। প্রথম ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল, দ্বিতীয়জন তাকে ঘোড়ার পাছার ওপর উলটে ফেলল, তার পা দুটো শূন্যে আর হাত দুটো ছড়িয়ে রইল। ইতোবাদ উঠে বসলেন, তবে তার উৎসাহহীন একান্ত বিরক্ত ভাব দেখে সমবেত দর্শকরা সবাই হাসতে লাগল। তৃতীয় ঘোড়সওয়ার বল্লম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না, বরং তার দিকে ছুটে এসে তার ডান পা ধরে আধপাক ঘুরিয়ে তাকে বালির ওপর ফেলে দিল। রঙ্গভূমির অশ্বরক্ষকরা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তাকে আবার জিনের উপর বসিয়ে দিল। চতুর্থ যোদ্ধা তাকে বা পা ধরে উলটে ফেলে দিল। দুয়ো দেওয়ার আওয়াজের ভেতরে তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, নিয়ম অনুসারে সেখানে তাকে তার রাত কাটাতে হবে; আর অতিকষ্টে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভাবতে লাগলেন, 'আমার মতো লোকের এ কী দুর্ভোগ!'

অন্যান্য অশ্বারোহী বীররা এর চেয়ে ভালোভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করলেন, তাদের কেউ কেউ দুজন যোদ্ধাকে পরাস্ত করলেন, কেউ কেউ তিনজন পর্যন্ত গেলেন। একমাত্র রাজা ওতামই চারজনকে পরাজিত করলেন। অবশেষে জাদিগের লড়ায়ে পালা এলো, পরপর চারজন ঘোড়সওয়ারকে তিনি অবলীলাক্রমে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলেন। সুতরাং দেখা রইল ওতাম আর জাদিগের মধ্যে কে কাকে পরাজিত করে। প্রথম জনের বর্ম-চর্ম ছিল নীল আর সোনালি একই রঙের পালক, জাদিগের ছিল সাদা। সমস্ত লোকের সমর্থন নীল ঘোড়সওয়ার আর সাদা ঘোড়সওয়ারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। রানির বুকটা ধুকধুক করছিল, তিনি দেবতার কাছে সাদা রঙের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন।

সেরা দুজন প্রতিযোগী এমন তীব্রবেগে ছুটে এসে ঘুরে যাচ্ছিলেন, একে অপরকে বল্লম দিয়ে এমন চমকপ্রদভাবে আঘাত করছিলেন, সওয়ারের ওপর এমন অবিচল হয়ে ছিলেন যে একমাত্র রানি ছাড়া সকলেই কামনা করছিল, ব্যাবিলনের দুজন রাজা হোক। অবশেষে তাদের ঘোড়া শ্রান্ত হয়ে পড়ল আর বল্লম টুকরো টুকরো হয়ে গেল, জাদিগ তখন একটা কায়দা করলেন : নীল রাজার পেছনে গিয়ে তিনি লাফিয়ে তার ঘোড়ার পেছন দিকটায় উঠে পড়লেন, তাকে শরীরের মাঝখানটায় ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় জিনের ওপর বসে পড়লেন আর খোলা মাঠে পড়ে থাকা ওতামের চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। সবমেত সমস্ত দর্শক চেঁচিয়ে উঠল, 'সাদা ঘোড়সওয়ারের জয়।'

অপমানিত ওতাম উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি কোষমুক্ত করলেন; জাদিগ তরবারি হাতে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারা দুজনে যুদ্ধভূমিতে নতুন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করলেন, সে যুদ্ধে কখনো ক্ষিপ্রতা কখনো বা শক্তি জয়গৌরব এনে দেয়। তাদের শিরস্ত্রাণের পালক, বাহুত্রাণের পেরেক, বর্মের আঙটা হাজার ত্বরিৎ আঘাতে ছিটকে পড়েছিল, তরবারির ডগা আর ধার দিয়ে তারা ডাইনে, বাঁয়ে, মাথায়, বুকে আঘাত হানছিলেন; তারা পেছনে হটছিলেন, এগিয়ে আসছিলেন, পরস্পরের শক্তি যাচাই করেছিলেন। পরস্পর মুখোমুখি হচ্ছিলেন, একে অন্যকে জাপটে ধরছিলেন, পরস্পর সাপের মতো জড়াজড়ি করছিলেন, পরস্পর সিংহের মতো আক্রমণ করছিলেন, পরস্পরকে হানা তরবারির আঘাত থেকে প্রতি মুহূর্তে আগুন ঠিকরে

পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত জাদিগ এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে থেমে গেলেন, একবার আক্রমণের ভান করলেন, তারপর ওতামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করলেন, তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন, আর ওতাম বলে উঠলেন, 'সাদা ঘোড়সওয়ার, আপনারই উচিত ব্যাবিলনের রাজত্ব করা।'

রানির আনন্দের আর সীমা রইল না। নীল ঘোড়সওয়ার আর সাদা ঘোড়সওয়ার দুজনকেই ফের নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী অন্যদেরও তাই করা হলো। বোবারা তাদের দেখাশুনা করতে আর খাবার দিতে এলো। যে জাদিগের কাজকর্ম করছিল সে রানির সেই খুদে বোবাটি কি না তা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে। তারপর তাদের পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত একা একা ঘুমাতে দেওয়া হলো, ভোরবেলা বিজয়ীকে নিজের প্রতীক চিহ্ন প্রধান মোহান্তের কাছে নিয়ে যেতে হবে সেই প্রতীক মিলিয়ে নেওয়া হবে আর বিজয়ী নিজের পরিচয় দেবেন।

প্রেমাবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জাদিগ এতই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতোবাদ তার কাছেই শুয়েছিলেন, তিনি একটুও ঘুমাননি। রাতে উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে তিনি প্রতীক চিহ্ন সমেত জাদিগের সাদা বর্ম ইত্যাদি নিয়ে তার জায়গায় নিজের সবুজ বর্মটা রেখে দিয়ে এলেন। ভোর হওয়ার আগেই তিনি প্রধান মোহান্তের কাছে তার মতো মানুষ যে বিজয়ী হয়েছে সেকথা সগর্বে ঘোষণা করতে গেলেন । এরকম ব্যাপার কেউ আশা করেনি; জাদিগ তখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন আর ইতোমধ্যে ইতোবাদকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হলো। বিস্মিতা আস্তার্তে হতাশ মনে ব্যাবিলনে ফিরে গেলেন। জাদিগের যখন ঘুম ভাঙল তখন সমস্ত রঙ্গভূমি প্রায় খালি। তিনি নিজের অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে ঐ সবুজ বর্ম ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলেন না। তার নিজের কাছে আর কিছুই না থাকায় তিনি ঐ বর্মেই নিজেকে ঢাকতে বাধ্য হলেন। বিস্মিত, আর বীতশ্রদ্ধ অবস্থায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কোনোরকমে আবরণগুলো গলিয়ে তিনি সাজে কোনোরকমে এগোতে লাগলেন।

দর্শকদের আসনে আর যুদ্ধভূমিতে তখনও যারা ছিল তারা দুয়ো দিয়ে তাকে বরণ করল। লোকে তাকে ঘিরে ধরল, মুখের ওপর তাকে অপমান করতে লাগল। অপমানের এরকম আঘাত মানুষের পক্ষে গায়ে না মাখা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তাকে অসম্মান করার ধৃষ্টতা যাদের হয়েছিল সেই জনতাকে তিনি তরবারির আঘাতে দূরে হটিয়ে দিলেন। কিন্তু কী যে করা যায় তার মাথায় আসছিল না। তিনি রানির সঙ্গে দেখা করতে পারেন না, রানির পাঠানো সাদা বর্ম দাবি করতে পারেন না, তাতে রানিকে ঝামেলায় জড়ানো হবে। এভাবে রানি যখন গভীর বেদনায় নিমজ্জিত, তখন জাদিগের অন্তরে ক্রোধের আগুন আর উদ্বেগ। তিনি ইউফ্রেটিসের তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তার মনে হলো যে জন্ম-নক্ষত্রই তার নিরুপায় হতভাগ্য হওয়াটা স্থির করে রেখেছে। কানাকে ঘৃণা করা স্ত্রীলোক থেকে বর্মের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত নিজের সমস্ত দুর্গতির ঘটনাই তার মনে জেগে উঠল।

তিনি ভাবতে লাগলেন, 'খুব বেশি দেরিতে ঘুম ভাঙার ফলেই এ ব্যাপারটা ঘটল। কিছুটা কম ঘুমালে ব্যাবিলনের রাজা হতাম, আস্তার্তেকে পেতাম। সুতরাং শাস্ত্র, আচার-বিচার, সাহস কেবলমাত্র আমার দুর্গতি ডেকে আনা ছাড়া কখনোই আর কোনো কাজে লাগে নি।'

শেষ পর্যন্ত তার বুক থেকে বিধির বিধানের বিরুদ্ধে গুমরে ওঠা ক্ষোভ বেরিয়ে এলো। একথা তার ভাবতে ইচ্ছে হলো যে সবকিছুই এক নিষ্ঠুর নিয়তির নিয়ন্ত্রণে, যে নিয়তি সৎ লোকদের দুঃখ দেয় আর সবুজ ঘোড়সওয়ারদের শ্রীবৃদ্ধি করে। সবুজ বর্ম পরে থাকাটা তার মনোকষ্টের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওটাই তাকে এমন বিদ্রুপের পাত্র করে তুলেছিল। একজন বণিক যাচ্ছিল, জাদিগ তাকে খুবই সামান্য দামে বর্মটা বেচে দিলেন আর তার কাছ থেকে একটি জোব্বা আর লম্বা টুপি নিলেন। ঐ বেশে তিনি ইউফ্রেটিসের তীর ধরে হাঁটতে লাগলেন, নৈরাশ্যে ভরা তার মন আর চিরদিন যা তাকে দুঃখ দিয়েছে সেই বিধির বিধানকে তিনি অভিযুক্ত করতে লাগলেন।

সন্ন্যাসী

ঘুরতে ঘুরতে জাদিগ এক সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন। শ্রদ্ধা জাগানো সাদা তার দাড়ি কোমরবন্ধ পর্যন্ত নেমে গেছে। তার হাতে একটি বই, বইটি তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। জাদিগ থামলেন। আর গভীর ভক্তি সহকারে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী তাকে এমন মনোরম আর সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে অভিবাদন করলেন যে জাদিগ তার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। জদিগ তাকে কী বই পড়ছেন জিজ্ঞেস করলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, 'এটা একটা ভবিতব্যের পুথি; তুমি কি এর থেকে কিছু পড়ে দেখতে চাও?'

তিনি জাদিগের হাতে বইটি দিলেন। নানা ভাষায় একান্ত পারদর্শী হয়ে জাদিগ ঐ বইয়ের একটি অক্ষরেরও পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না। এই ব্যাপারটা তার কৌতূহলকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল।

দয়ালু সন্ন্যাসীটি বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি খুবই দুঃখী।'

জাদিগ বললেন, 'হায়রে, সে দুঃখের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

বৃদ্ধ তখন বললেন, 'তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমায় সঙ্গ দিয়ে আমি হয়তো তোমার কাজে লাগতে পারি। কখনো কখনো বেদনার্তদের অন্তরে আমি সান্ত্বনার বোধ এনে দিয়েছি।'

সন্ন্যাসীর চেহারা, দাড়ি আর বইটির জন্য জাদিগের মনে ভক্তি জেগেছিল। তার কথাবার্তার মধ্যে উচ্চ মার্গের জ্ঞানের আলো রয়েছে বলে জাদিগের মনে হয়েছিল। সন্ন্যাসী এমন প্রাণবন্ত আর মর্মস্পর্শী দৃপ্তকণ্ঠে নিয়তি, ন্যায়বিচার, নীতিবোধ, পরম মঙ্গল, মানুষের দুর্বলতা, পুন্য এবং পাপ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যে জাদিগ এক অমোঘ সম্মোহনে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। জাদিগ তাকে অনুনয় করে বললেন যে, ব্যাবিলনে তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত সন্ন্যাসী যেন তাকে ফেলে চলে না যান।

বৃদ্ধ জাদিগকে বললেন, 'তোমার কাছে এই অনুগ্রহটা আমার কাম্য। আমার কাছে অরোসমাদের নামে শপথ করে বলো যে আজ থেকে কয়েকটা দিনের মধ্যে যে কাজই আমি করি না কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে না।

জাদিগ শপথ করলেন আর তারা দুজনে যাত্রা করলেন।

সন্ধ্যাবেলায় পর্যটক দুজন অপূর্ব এক রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী তার নিজের আর সঙ্গী তরুণের জন্য আতিথেয়তা কামনা করলেন। দ্বাররক্ষকটিকে দেখলে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে ভুল হতে পারে। এক ধরনের অবজ্ঞা মেশানো সহৃদয়তা দেখিয়ে সে তাদের ভেতরে নিয়ে গেল। প্রধান ভৃত্যের কাছে তাদের হাজির করা হলো, সে তাদের তার মনিবের চমৎকার ঘরদোর দেখাল। যেখানে গৃহস্বামী খেতে বসেছেন সেখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো, দূরে এক কোণায় তাদের বসতে দেওয়া হলো, দুর্গাধিপতি একটিবার চোখ তুলে তাকিয়েও তাদের আপ্যায়ন করালেন না; তবে তাদের অন্য সবার মতোই রুচিসম্মতভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া হলো। তারপর তাদের হাত-মুখ ধোয়ার জন্য চুন্নি আর পান্না বসানো একটি সোনার পাত্র দেওয়া হলো। সুন্দর একটি কক্ষে তাদের শুতে দেওয়া হলো, আর পরের দিন ভোরবেলা একজন চাকর তাদের দুজনকে একটি করে মোহর দিয়ে গেল, এরপর তাদের বিদায় দেওয়া হলো।

পথে জাদিগ বললেন, 'একটু দাম্ভিব হলেও গৃহকর্তা লোকটিকে আমার দানশীল বলেই মনে হলো, খুবই সম্মান সহকারে উনি অতিথির সেবা করেন।'

কথাগুলো বলতে বলতে জাদিগের চোখে পড়ল যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঝোলার মতো যে বস্তুটি রয়েছে সেটা যেন ফুলে-ফেঁপে ঝুলে পড়েছে, তার ভেতর তিনি পাথর বসানো দামি গামলাটি দেখতে পেলেন, সন্ন্যাসী ওটি চুরি করেছেন। প্রথমে মুখ ফুটে কিছু বলতে তার সাহস হলো না, তবে ব্যাপারটা তাকে দারুণ অবাক করল।

দুপুরের দিকে খুবই ছোট্ট একটি বাড়ির দরজায় সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ঐ বাড়িতে ধনী এক কৃপণের বাস। সন্ন্যাসী সে বাড়িতে কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় চাইলেন। কুৎসিত পোশাক-আসাক পরা এক বুড়ো সরকার রূঢ় কণ্ঠে তাদের আপ্যায়ন করল এবং সন্ন্যাসী আর জাদিগকে আস্তাবলে নিয়ে গেল, সেখানে গোটা কয়েক পচা জলপাই, বাজে রুটি আর নষ্ট হয়ে যাওয়া বিয়ার তাদের খেতে দেওয়া হলো। সন্ন্যাসী আগের দিনের মতো পরিতৃপ্ত ভাবে খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করলেন। তারা কিছু চুরি করেন কি না দেখার জন্য বৃদ্ধ সরকারটি তাদের ওপর নজর রাখছিল আর তাদের বিদায় নিতে তাড়া দিচ্ছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্ন্যাসী সকালবেলা পাওয়া দুটি মোহর তাকে দিলেন এবং সমস্ত সেবাযত্নের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

তিনি আরও বললেন, 'আপনার কাছে নিবেদন, আপনার মনিবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন।'

হতভম্ব সরকার পথিক দুজনকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী বললেন, 'প্রভু, যে অতুলনীয় মহত্ত্ব সহকারে আপনি আমাদের আপ্যায়ন করেছেন, তার জন্য আপনাকে শুধু বিনীত ধন্যবাদ জানাতে পারি, দয়া করে আমার কৃতজ্ঞ চিত্তের যৎকিঞ্চিত প্রতিদান হিসেবে এই সোনার পাত্রটি গ্রহণ করুন।'

কৃপণের তো উলটে পড়ার অবস্থা। সন্ন্যাসী তাকে বিস্ময়ের ঘোর থেকে সম্বিত ফিরে পাওয়ার অবকাশ দিলেন না, তরুণ পথিকটিকে সঙ্গে করে অতি দ্রুত বিদায় নিলেন। জাদিগ তাকে বললেন, 'বাবাজি, এসব কী দেখছি? কোনো কিছুতেই

আপনাকে আমার আর সব লোকের মতো মনে হয় না : যে সম্ভ্রান্ত লোকটি অতি চমৎকারভাবে আপনাকে আপ্যায়ন করলেন তার পাথর বসানো সোনার পাত্রটি আপনি চুরি করলেন, আর সে পাত্র দান করলেন এমন এক কৃপণকে যে আপনার সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করেছে।

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'বাছা, ঐ মহৎ লোকটি শুধুমাত্র অহংকারের বশে আর নিজের ঐশ্বর্য দেখিয়ে মুগ্ধ করার জন্য অতিথিদের আপ্যায়ন করে, সে আরও ভদ্র হয়ে উঠবে, কৃপণ লোকটি আথিতেয়তা করতে শিখবে। কোনো কিছুতে অবাক হয়ো না, আমায় অনুসরণ কর।'

জাদিগ বুঝে উঠতে পারছিলেন না, যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে তিনি সবচেয়ে উন্মাদ বা সবচেয়ে জ্ঞানী। কিন্তু সন্ন্যাসী খুবই কর্তৃত্বের সুরে কথা বলছিলেন আর তার ওপর জাদিগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্বভাবতই তিনি সন্ন্যাসীকে অনুসরণ না করে পারলেন না।

সন্ধ্যাবেলা তারা একটি বাড়িতে উপস্থিত হলেন, বাড়িটি সুন্দরভাবে গড়া অথচ সাদাসিধে, সে বাড়ির কোনো কিছুই অপচয় কিংবা পরিচয় দেয় না। গৃহস্বামী একজন দার্শনিক, সংসার থেকে অবসর নিয়ে নিরিবিলিতে তিনি জ্ঞান ও পুণ্যের সাধনা করেন, তা সত্ত্বেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন না। এই নিভৃত আশ্রয় তৈরি করাটা তার পছন্দসই হয়েছিল আর এই বাড়িতে অতিথিদের খুবই সহৃদয়ভাবে অর্ভথ্যনা করেন, সেই আপ্যায়নে কোনো লোক-দেখানো ব্যাপার থাকে না। তিনি নিজেই অতিথি দুজনের সামনে হাজির হলেন। প্রথমে আরামদায়ক একটি ঘরে তিনি তাদের বিশ্রাম করতে দিলেন। কিছুক্ষণ পর নিজে এসে তিনি তাদের উপযুক্ত আহার্য গ্রহণের জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন। আর খেতে খেতে স্বভাবতই ভদ্রতাবশত ব্যাবিলনের সর্বশেষ পট পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুললেন। মনে হলো, তিনি আন্তরিকভাবে রানির অনুগত, আর রাজমুকুটের দাবি নিয়ে যুদ্ধভূমিতে জাদিগের উপস্থিতি তার কাম্য ছিল।

তিনি আরও বললেন, 'তবে লোকে জাদিগের মতো রাজা পাওয়ার যোগ্য নয়।'

জাদিগ লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিলেন আর তার কষ্ট যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছিল বলে বোধ হচ্ছিল। আলোচনায় এ সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ রইল না যে সংসারের সমস্ত কিছু সব সময় সবচেয়ে জ্ঞানীদের ইচ্ছেমতো ঘটে না! সন্ন্যাসী সারাক্ষণ বলে গেলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার গতি লোকে বুঝতে পারে না, আর মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দেখে সমগ্রকে বিচার করতে গিয়েই ভুল করে।

ভালোবাসার কথা উঠল। জাদিগ বললেন, 'ওহ, কী মারাত্মক এই ভালোবাসা।'

সন্ন্যাসী আবার বললেন, 'ভালোবাসা হলো সেই হাওয়া যা জাহাজের পাল ফুলিয়ে দেয়। কখনো-সখনো সেই হাওয়া জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়, তবে তাকে বাদ দিয়ে জাহাজ চলতে পারে না। পিত্ত মানুষকে বদমেজাজি আর অসুস্থ করে তোলে, কিন্তু পিত্ত না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না, সংসারে সবকিছুই মারাত্মক আর সবকিছুই দরকারী।'

সুখের কথা উঠল, আর সন্ন্যাসী বুঝিয়ে দিলেন সে সুখ দেবতার দান।

তিনি বললেন, 'কেননা মানুষ তো নিজের ভেতর অনুভূতি বা ধারণা তৈরি করতে পারে না, সমস্তই সে পায়, তার জীবনের মতো সুখ-দুঃখও তার কাছে আসে অন্য কোথা থেকে।"

মুগ্ধ হয়ে জাদিগ ভাবতে থাকলেন যে লোকটি এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করল সেই কি না এমন চমৎকার যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে। অবশেষে একাধারে শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় আলাপ-আলোচনার পর গৃহস্বামী অতিথি দুজনকে আবার তাদের ঘরে নিয়ে গেলেন, এমন জ্ঞানী-গুণী দুজন মানুষকে তার কাছে পাঠানোর জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রশস্তি করলেন। তিনি তাদের অর্থ দিতে চাইলেন, তবে তা খুবই সহজভাবে আর মর্যাদা সহকারে, ফলে কাউকে তা অসন্তুষ্ট করতে পারে না। সন্ন্যাসী অর্থ নিলেন না আর তাকে বললেন যে তিনি তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, ভোর হওয়ার আগেই তিনি ব্যাবিলনে রওনা হতে চান। তাদের বিদায়টা খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হলো, এমন একজন অমায়িক মানুষের প্রতি জাদিগ বিশেষভাবে শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ বোধ করেছিলেন।

নিজেদের ঘরে এসে জাদিগ আর সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ গৃহস্বামীর প্রশংসা করলেন; ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বৃদ্ধ তার সঙ্গীকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, তবে সবাই যখন ঘুমাচ্ছে তার মধ্যে এই লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা আর প্রীতির চিহ্ন রেখে যেতে চাই। বলতে বলতে একটি মশাল নিয়ে তিনি বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আতঙ্কিত জাদিগ আর্তনাদ করে এরূপ ভয়াবহ কাজ থেকে সন্ন্যাসীকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। সন্ন্যাসী এক দুর্নিবার শক্তিতে

জাদিগকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বাড়িটি জ্বলছিল। সন্ন্যাসী তার সঙ্গীকে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে দেখতে থাকলেন বাড়িটা জ্বলছে।

তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের জয় হোক, আমার প্রিয় অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর বাড়িটির নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ধ্বংস হলো, ভাগ্যবান পুরুষ!'

কথা শুনে জাদিগের ইচ্ছে হলো একই সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠতে, মাননীয় সন্ন্যাসী ঠাকুরটিকে গালিগালাজ করতে, তাকে মেরে ধরে পালিয়ে যেতে, কিন্তু এর কোনোটিই তিনি করলেন না, এবং সন্ন্যাসীর ক্ষমতায় বশীভূত হয়ে শেষ আশ্রয় পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলেন।

এবার তারা দয়াশীল আর পুণ্যবতী এব বিধবা মহিলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ বিধবার চৌদ্দ বছরের এক বোনপো ছিল। ছেলেটি খুবই হাসিখুশি আর বিধবার একমাত্র ভরসা। বাড়ির ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য মহিলা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। পরদিন তিনি বোনপোকে অতিথিদের সাঁকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন হলো সাঁকোটি ভেঙে গিয়ে পারাপারের পথ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ছেলেটি প্রবল উৎসাহে তাদের সামনে সামনে হাঁটছিল।

তারা যখন সাঁকোর ওপর উঠলেন তখন সন্ন্যাসী ছেলেটিকে বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমার মাসিকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।'

এরপর তিনি চুলে ধরে ছেলেটিকে নদীতে ফেলে দিলেন। ছেলেটা পড়ে গেল, মুহূর্তের জন্য একবার জলের ওপর ভেসে উঠে তীব্র স্রোতের অতলে হারিয়ে গেল।

জাদিগ চিৎকার করে উঠলেন, 'রাক্ষস, পাষণ্ড, নরাধম।'

তাকে বাঁধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমার এর চেয়ে বেশি ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ার কথা। জেনে রাখো ঈশ্বরের ইচ্ছা যে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তার ধ্বংসস্তূপের তলায় গৃহস্বামী বিপুল এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন; জেনে রাখো, ঈশ্বরের ইচ্ছা যেই ছেলেটির ঘাড় মটকে দিল সে এক বছরের মধ্যে তার মাসিকে আর দুবছরের মধ্যে তোমাকে হত্যা করত।

জাদিগ চিৎকার করে বললেন, 'বর্বর, একথা কে তোকে বলল? তোর ভবিতব্যের পুথিতে যদি একথা পড়ে থাকিস তবু, যে তোর কোনো ক্ষতি করেনি সে ছেলেটিকে ডুবিয়ে মারার অধিকার কি ঐ বই তোকে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে ব্যাবিলনবাসী দেখতে পেলেন বৃদ্ধের আর দাড়ি নেই, তার মুখে যৌবনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তার সন্ন্যাসীর বসন অন্তর্হীত; সুন্দর চারটি ডানা উজ্জ্বল মহিমাময় এক দেহকে ঢেকে রেখেছে।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জাদিগ বললেন, 'হে স্বর্গের প্রেরিত পুরুষ, হে দেবদূত, তাহলে কি দুর্বল এক নশ্বর মানুসকে শাশ্বত আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা দিতে তুমি দিব্যধাম থেকে নেমে এসেছ।

দেবদূত জেসরাদ বললেন, 'কিছু না জেনে মানুষ সবকিছুর বিচার করে : মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো পাওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ছিল তোমার।'

জাদিগ তার কাছে কথা বলার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, 'নিজের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। একটা সন্দেহ দূর করার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি। ঐ ছেলেটিকে ডুবিয়ে না মেরে শুধরে দিলে, গুণবাণ করে তুললে কি আরও ভালো হতো না?' তখন জেসরাদ জবাব দিলেন, 'গুণবান হয়ে বেঁচে থাকলেও নিজেকে, যে স্ত্রীলোককে বিয়ে করত তাকে আর ঐ স্ত্রীর গর্ভে জন্মানো পুত্রকে হত্যা করত, এই হতো তার ভবিতব্য।'

জাদিগ বললেন, 'অদ্ভুত! অপরাধ আর দুর্ভাগ্য থাকুক এবং সৎ লোকের কপালে দুর্ভোগ ঘটুক এটাই কি তাহলে প্রয়োজনীয়?'

জেসরাদ উত্তর দিলেন, 'অসৎ লোক চিরকাল অসুখী : তারা পৃথিবীময় সামান্য কিছু ন্যায়নিষ্ঠ লোকের পরীক্ষা করার কাজে লাগে আর জগতে এমন কোনো খারাপ ব্যাপার নেই যার থেকে কিছু না কিছু মঙ্গলের উৎপত্তি হয় না।'

জাদিগ বললেন, 'কিন্তু খারাপের বদলে যদি কেবল ভালোই থাকত?'

জবাবে জেসরাদ বললেন, 'তাহলে এই পৃথিবীটা অন্য এক পৃথিবীতে পরিণত হতো; একের পর এক ঘটনাগুলো হয়ে উঠত প্রজ্ঞার সুশৃঙ্খল বিন্যাস। যেখানে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান একমাত্র সেখানেই রয়েছে সম্ভাব্য এই নিখুঁত শৃঙ্খলা। অমঙ্গল পরমেশ্বরের ধারেকাছে থাকতে পারে না; তিনি সৃষ্টি করেছেন কোটি কোটি বিশ্ব, কিন্তু তার কোনোটাই অন্য কোনোটার মতো নয়। এই বিপুল বৈচিত্র্য তার বিরাট শক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে গাছের এমন দুটি পাতা নেই অথবা অসীম আকাশে এমন দুটি ভূমণ্ডল নেই যারা একরকমের; আর যে ক্ষুদে অনুটিতে তুমি জন্মেছ তার বুকে যেখানে যা কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছ, সর্বব্যাপ্ত পুরুষের অমোঘ বিধানে সেখানেই তার নিজের জায়গায়, তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তার থাকার কথা। মানুষ ভাবে, ঐ যে ছেলেটি প্রাণ হারাল সে দৈবাৎ জলে পড়ে গিয়েছিল, আর ঠিক

তেমনি দৈবাৎ বাড়িটি পুড়ে গেল, কিন্তু কিছুই হঠাৎ ঘটে না, সবকিছুই হয় পরীক্ষা, নয় শাস্তি, নয় পুরস্কার, নয় দূরদৃষ্টি। ঐ জেলের কথা স্মরণ কর, সে নিজেকে সবচেয়ে হতভাগ্য বলে ভাবছিল। তার ভাগ্য ফেরানোর জন্য অরোস্মাদ তোমায় পাঠিয়ে দিলেন। দুর্বল নশ্বর জীব, যাকে ভক্তিভরে মাথা পেতে নেওয়া উচিত তার বিরুদ্ধে আর তর্ক কর না।

জাদিগ বললেন, 'কিন্তু...'

তাঁর 'কিন্তু' বলার মুহূর্তে দেবদূত দিব্যলোকের দিকে উড়ে যাচ্ছিলেন। নতজানু জাদিগ ভক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

উর্ধ্বলোক থেকে দেবদূত চিৎকার করে জাদিগকে বললেন, 'ব্যালিনলের পথে রওনা হও।

প্রহেলিকা

কাছাকাছি বজ্রপাত ঘটলে মানুষ যেমন করে হাঁটে বিহ্বল জাদিগ তেমনি এলোমেলো হাঁটছিলেন। তিনি ব্যাবিলনে প্রবেশ করলেন। যারা রঙ্গভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেদিন তারাই ইতোমধ্যেই প্রহেলিকার সমাধান করতে আর প্রধান মোহান্তের প্রশ্নের জবাব দিতে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে সমাবেত হয়েছিলেন। এক সবুজ বর্ম ছাড়া সমস্ত যোদ্ধরা উপস্থিত। জাদিগকে শহরে দেখা যেতেই জনতা তাকে ঘিরে ধরল; তাকে দেখতে পেয়ে চোখের, তার জয়ধ্বনি দিয়ে মুখের, সাম্রাজ্য তার হোক কামনা করে অন্তরের যেন আর সাধ মিটছিল না। তাকে যেতে দেখে হিংসুক চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিল। জনাত তাকে সভাস্থল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল, রানিকে জাদিগের উপস্থিতির কথা জানানো হলো, শুনে আশা আর আশংকার দোলায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, উদ্বেগ যেন তাকে গ্রাস করতে থাকল, তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন জাদিগ নিরস্ত্র আর কী করে ইতোবাদ; সাদা বর্ম পরে আছেন। আবার জাদিগকে দেখে লোক বিস্মিত আর উৎফুল্ল হলো, কিন্তু যে অশ্বারোহী বীররা লড়াই করেছিলেন ঐ সভায় একমাত্র তাদের উপস্থিত হওয়ার অধিকার ছিল।

জাদিগ বললেন, 'আর সবাইয়ের মতো আমিও যুদ্ধ করেছি; কিন্তু এখনে অন্য একজন আমার বর্ম-চর্ম পরে রয়েছেন; আর তা প্রমাণ করার আগে আমাকে প্রহেলিকা মীমাংশায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মতামত যাচাই করা হলো, লোকের মনে জাদিগের সততার স্মৃতি তখনও এতটা গভীরভাবে আঁকা ছিল যে তাকে থাকতে দিতে কেউ কোনো দ্বিধা করল না।

প্রধান মোহান্ত প্রথমে যে প্রশ্ন উত্থাপিত করলেন তা হলো এই : 'জগতের সবকিছুর মধ্যে কোন জিনিসটা সবচেয়ে দীর্ঘ আর সবচেয়েহ্রস্ব, সবচেয়ে দ্রুত আর সবচেয়ে ধীর, সবচেয়ে বিভাজ্য আর সবচেয়ে অবহেলিত আর সবচেয়ে বিস্তীর্ণ, সবচেয়ে অবহেলিত আর সবচেয়ে অনুতাপের বিষয়; যাকে বাদ দিয়ে কিছুই ঘটে না, নগণ্য সমস্ত কিছুকে যে গ্রাস করে, মহৎ সমস্ত কিছুকে যে বাঁচিয়ে রাখে?'

ইতোবাদের, বলার কথা তিনি জবাব দিলেন যে তার মতো লোকের পক্ষে প্রহেলিকার বিন্দু-বিসর্গ বোঝা সম্ভব নয় আর বল্লমের তীব্র আঘাতে জয়ী হওয়াটাই যথেষ্ট। কেউ কেউ বলল ধাঁধার জবাব হলো ধনসম্পদ, আরেকদল বলল পৃথিবী, আবার কেউ কেউ বলল আলো। জাদিগ উত্তর দিলেন, 'জিনিসটা হলো সময়।'

তিনি আরও বললেন, 'কিছুই এর চেয়ে দীর্ঘ নয় কেননা তা দিয়েই মাপা হয় অনন্তকালকে, কিছুই এর চেয়েহ্রস্ব নয় কেননা সমস্ত পরিকল্পনাতেই এর অভাব ঘটে। যে প্রতীক্ষা করে তার কাছে এর চেয়ে কিছুই মন্থর নয়, যে সুখ ভোগ করে তার কাছে এর চেয়ে কিছুই মন্থর নয়, সে ভোগ করে তার কাছে এর চেয়ে কিছুই দ্রুত নয়, বিরাটত্বে এর বিস্তার অনন্ত অবধি, ক্ষুদ্রতায় এর অন্তহীন বিভাগ সমস্ত মানুষ একে অবহেলা করে, সবাই এর বিনাশে অনুশোচনা করে, একে বাদ দিয়ে কিছুই ঘটে না, যা কিছু ভাবীকালের অযোগ্য এ তাকে ভুলিয়ে দেয় আর মহৎ ব্যাপারগুলোকে অমর করে রাখে।'

সভা স্বীকার করল যে জাদিগের উত্তরই যথার্থ।

এরপর প্রশ্ন করা হলো, 'কোন জিনিসটা ধন্যবাদ না দিয়েই লোকে গ্রহণ করে, যাকে না জেনেই লোকে ভোগ করে, যা কোথায় রয়েছে না জেনেই লোকে অন্যকে দান করে, আর যা নিজের অজ্ঞাতেই লোকে হারায়?'

প্রত্যেকে নিজস্ব জবাব দিল। একমাত্র জাদিগই অনুমান করলেন, সে জিনিসটা হলো জীবন। একইভাবে জাদিগ অন্য সব প্রহেলিকারও সহজে মীমাংসা করলেন। ইতোবাদ সারাক্ষণ বলে যাচ্ছিলেন যে এর চেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারে না, আর মাথা ঘামালে তিনিও অনায়াসে একই মীমাংসায় পৌঁছাতে পারতেন।

ন্যায়বিচার, পরম মঙ্গল আর রাজ্যশাসন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। জাদিগের উত্তরগুলো সবচেয়ে সারগর্ভ বলে বিবেচিত হলো।

লোকে বলতে লাগল, 'এরকম চিন্তাশীল লোকরে এমন খারাপ যোদ্ধা হওয়াটা খুবই দুঃখের কথা।'

জাদিগ বললেন, 'সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট জনমণ্ডলী, যুদ্ধভূমিতে জয়লাভের সম্মান আমিই লাভ করেছিলাম। সাদা বর্ম আমারই, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন ইতোবাদ মহাশয় তা আত্মসাৎ করেছেন : তিনি নিশ্চয় বিবেচনা করেছিলেন যে সবুজ বর্মের চেয়ে ওটাই তাকে ভালো মানাবে, আমার কাছ থেকে নেওয়া সুন্দর ঐ সম্পূর্ণ বর্মের বিপক্ষে আমার তরবারি আর জোব্বা নিয়ে আমি এখনই আপনাদের কাছে প্রমাণ করে দিতে পারি যে বীর ওতামকে পরাস্ত করার গৌরব আমিই অর্জন করেছি।'

একান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইতোবাদ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করলেন। তার এতটুকু সন্দেহ ছিল না যে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, বাহুত্রাণ পরা অবস্থায় তিনি ঘরে পরার জোব্বা গায়ে আর শুতে যাওয়ার টুপি মাথায় সেরা প্রতিযোগীকে সহজেই খতম করতে পারবেন না।

রানিকে অভিবাদন করে জাদিগ তার তরবারি কোষমুক্ত করলেন। আশা আর আশংকায় বিহ্বল রানি তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাউকে কোনো অভিবাদন না করে ইতোবাদ তার তরবারি নিষ্কোষিত করলেন। নির্ভীক পুরুষদের মতো তিনি জাদিগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি জাগিদের মাথাটা চৌচির করে দিতে প্রস্তুত। তরবারির হাতলের দিকের ভারী অংশটা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর তরবারির মাথার দিকের দুর্বল অংশটা আটকে দিয়ে জাদিগ এমনভাবে আঘাতটা প্রতিহত করলেন যে ইতোবাদের তরবারি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জাদিগ তখন তার শত্রুকে জাপটে ধরে চিত করে মাটিতে ফেলে দিলেন; আর বর্মে ঢাকা নয় শরীরের এমন অংশে তরবারির মাথা ঠেকিয়ে বললেন, তোমায় নিরস্ত্র করতে দাও, তাহলে তোমাকে হত্যা করব।'

তার মতো মানুষের অবমাননায় চিরকাল বিস্মিত ইতোবাদ জাদিগকে তাই করতে দিলেন। জাদিগ ধীরেসুস্থে ইতোবাদের অপূর্ব শিরস্ত্রাণ, চমৎকার বক্ষ ও পৃষ্ঠত্রাণ, সুন্দর বাহুত্রাণ, দীপ্তিময় উরুত্রাণ খুলে নিয়ে নিজে তা পারলেন, আর ঐ বেশে আস্তার্তের সামনে লুটিয়ে পড়ার জন্য ছুটে গেলেন। ঐ বর্মচর্ম সবই যে জাদিগের কাদর তা সহজেই প্রমাণ করে দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিশেষভাবে আস্তার্তের সম্মতিতে জাদিগ রাজা বলে স্বীকৃত হলেন। এত দুর্দশার পর তার প্রেমিক বিশ্ব-সংসারের চোখে তার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করল দেখতে পাওয়ার মাধুর্যটা আস্তার্তে উপভোগ করেছিলেন। জাদিগ রাজা হলেন, সুখী হলেন। দেবদূত জেসরাদ তাকে যা বলেছিলেন তা তার মনে ছিল। এমনকি হীরে হওয়া বালির কণার কথাও তিনি স্মরণ করছিলেন। জাদিগ আর রানি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার প্রতি ভক্তি জানালেন। সুন্দরী খেয়ালি মিসুফকে জাদিগ ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিলেন। দস্যু আর্বোগাদকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে সেনাবাহিনীতে সম্মানিত একটি পদ দিলেন। জাদিগ তাকে কথা দিলেন যে যথার্থ শৌর্যের পরিচয় দিলে সবচেয়ে উঁচু পদে তার পদোন্নতি হবে আর ডাকাতি করলে ফাঁসি হবে।

আরব দেশের অভ্যন্তর থেকে সুন্দরী আলমোনা সহ সেতককে ডেকে আনা হলো। তিনি হলেন ব্যাবিলনের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকর্তা। কাদর তার কাজ অনুযায়ী মর্যদা ও সমাদর লাভ করলেন, তিনি হলেন রাজার বন্ধু, আর রাজা হলেন পৃথিবীর একমাত্র নরপতী যার একজন প্রকৃত বন্ধু রইল। খুদে বোবাটার কথাও ভোলা হয়নি। জেলেকে সুন্দর একটা বাড়ি দেওয়া হলো। অর্ককে শাস্তি দেওয়া হলো, সে জেলেকে প্রভূত অর্থ দেবে এবং তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু ইতোমধ্যে জেলের জ্ঞানোদয় হয়েছিল, সে কেবল অর্থই গ্রহণ করল।

জাদিগ কানা হয়ে যাবে ভেবেছিল বলে সুন্দরী সেমির কিছুতেই নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছিল না আর জাদিগের নাক কাটতে গিয়েছিল বলে আজোরার কান্না আর থামছিল না। উপহারসামগ্রী পাঠিয়ে জাদিগ তাদের দুঃখকে প্রশমিত করলেন। হিংসুক হিংসার উন্মুক্ততা আর লজ্জায় মারা গেল। সারা দেশে শান্তি, গৌরব আর সমৃদ্ধি ভোগ করতে লাগল। সেটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শতাব্দী; প্রেম আর ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়েছিল। জাদিগের মহিমা কীর্তন করত লোকে আর জাদিগ মহিমাকীর্তন করতেন ঈশ্বরের।